بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নূরুদ্দীন

NURUDDIN

২০১৮

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

নূরুদ্দীন
NURUDDIN

বর্ষ ৯ ■ সংখ্যা ১ ■ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের মুখপত্র

সম্পাদকীয় পরিষদের সভাপতি

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

সম্পাদক

মাসুম আহমদ

সহকারি সম্পাদক

ইয়াছিন আহমদ
সুলতান মাহমুদ আনোয়ার

তথ্য সম্পাদক

সৈয়্যদ মুজাফ্ফর আহমদ

সার্বিক সহযোগিতায়

রশিদ আহমদ
মোহাম্মদ আল হক

ছাত্র প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আবু সালেহ
সফিক আহমদ চৌধুরী

প্রচ্ছদ

মাহমুদুর রহমান রিয়েল

প্রকাশক

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

JAMIA AHMADIYYA BANGLADESH
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
Phone: +88 02 7300428, Fax: +88 02 7301854
e-mail: jamia.bd2006@gmail.com

মুদ্রণে

ইন্টারকন এসোসিয়েটস, ৪৫/এ নিউ আরামবাগ, ঢাকা

সূচিপত্র

৪	**কুরআন**
৫	**হাদীস**
৬	**অমৃত বাণী**
৭	**হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী**
৯	**সন্তানের তরবিয়তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আদর্শ** মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
১২	**হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সা.)-এর দিব্য দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের শুভ সংবাদ** আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
১৬	**কুরআন ও হাদীসের মাপকাঠিতে 'আগমনকারী ইমাম মাহ্দী (আ.)'-এর পদমর্যাদা** মাওলানা বশিরুর রহমান
২০	**'একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ' ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন** মাওলানা মাসুম আহমদ
২৩	**হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীদের দৃষ্টান্তমূলক পরিণাম** মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার
২৮	**নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)** মাওলানা হাজারী আহমদ আল-মুনিম
৩১	**হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে একজন আদর্শ ওয়াকেফে জিন্দেগী** মাওলানা নাসের আহমদ
৩৪	**ইসলামের প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গভীর অনুরাগ** মাওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ
৩৭	**আপন শিষ্যদের সাথে হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর দয়া ও সহমর্মিতার আচরণ** মাওলানা রশিদ আহমদ
৪২	**হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিপরায়ণতা** মাওলানা নাভিদুর রহমান
৪৫	**আলোকচিত্র**
৫৩	**হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলীর সাধারণ পরিচিতি** মাওলানা মুহাম্মদ আল হক
৫৬	**হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী পাঠের গুরুত্ব ও ফযিলত** মৌলভী মোহাম্মদ মজীদুল ইসলাম
৫৮	**কবিতা 'ধন্য আমি'** মুহাম্মদ উসমান গনি, ছাত্র: ৪র্থ বর্ষ
৫৯	**প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর শৈশবকাল** মাসুম আহমদ, ছাত্র: ৪র্থ বর্ষ
৬১	**আলোকচিত্র**
৬৯	**ঘুরে এলাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেট** মুহাম্মদ তারীফ হোসেন, ছাত্র: ৪র্থ বর্ষ
৭১	**কবিতা 'প্রভুর খোঁজে'** সফিক আহমদ চৌধুরী, ছাত্র: ৪র্থ বর্ষ
৭২	**শিক্ষা সফর - ২০১৭** সাকিবুল হাসান, ছাত্র: ৬ষ্ঠ বর্ষ

সম্পাদকীয়

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সব ধর্মের ওপর বিজয় দান করেন। আর মুশরিকরা যত অপছন্দই করুক না কেন। *(সুরা আস্ সাফ্ফ: ১০)*

সকল তফসীরকারক আলেমগন এ বিষয়ে একমত যে, এই আয়াতে হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে ইসলামের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ
الْمَهْدِيِّينَ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য প্রথমে আমার সুন্নত তারপর আমার খলীফাগনের সুন্নত অনুসরণ করা ফরয, যারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত মাহ্দী খলীফা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন :

تو میری طرف سے نذیر ہے۔ میں نے تجھے بھیجا
تا مجرم نیکوکاروں سے الگ کئے جائیں

"তুমি আমার পক্ষ থেকে সতর্ককারী। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি যেন সদাচারী ও সাধুগণ থেকে অপরাধীদের পৃথক করা যায়।"

এর অর্থ এই যে, যারা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত মসীহ্ মওউদ ও মাহ্দী মওহুদ বলে বিশ্বাস করে তাঁর প্রতি ঈমান আনে তারা সাধু ও সদাচারী, আর অন্যরা অপরাধী। *(আল্ ওসীয়্যত, পৃ:১২)*

অতএব, আহমদীদের সহজে বুঝতে পারা উচিৎ যে, তারা যেন সাধু ও সদাচারী হয়ে যান। আর যদি সাধু ও সদাচারী হতে হয় তাহলে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আখলাখ অর্থাৎ চরিত্রের অনুকরণ ও অনুসরণ করা আবশ্যক। এজন্য আমরা আমাদের বার্ষিক মুখপত্র **'নূরুদ্দীন'**-এর এবারের সংখ্যার বিষয়বস্তু হিসেবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র সীরাতকে বেছে নিয়েছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন:
"তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে, খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের ময়দান শূন্য। সকল জাতি সংসার প্রেমে মত্ত। খোদা তা'লা যাতে সন্তুষ্ট হন, জগদ্বাসীর সেদিকে কোন লক্ষ্য নেই। যারা পূর্ণ উদ্যমের সাথে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চান, তাদের জন্য নিজেদের সৎগুনের পরিচয় দিবার এবং খোদার নিকট থেকে বিশেষ পুরস্কার লাভের এটাই সুযোগ। *(আল-ওসীয়্যত, পৃ:২০)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন:
"দেখ, আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে, যে ধর্মের সাথে কিছু পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ রাখে। 'জাহান্নাম ' সেই আত্মার নিকটে, যার সব কামনা-বাসনা খোদার জন্য নয়, বরং কিছু খোদার জন্য এবং কিছু দুনিয়ার জন্য। সুতরাং তোমাদের উদ্দেশ্য সমূহে যদি পার্থিবতার অণুমাত্র সংমিশ্রণ থাকে, তবে তোমাদের সব ইবাদত বৃথা। এমতাবস্থায় তোমরা খোদার অনুবর্তিতা কর না বরং শয়তানের অনুবর্তিতা কর.....।" *(আল-ওসীয়্যত, পৃ:১৯)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেছেন:
"সেই প্রেম পরিহার কর, যা খোদার ক্রোধের নিকটবর্তী করে। তোমরা যদি বিশুদ্ধ চিত্ত নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হও তবে তিনি সব দিক দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং কোন শত্রু তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।" *(আল-ওসীয়্যত, পৃ:১৮)*

আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি আমাদের উচিৎ আল্লাহ্ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। আর কৃতজ্ঞতা স্বীকারের উপায় হচ্ছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা মেনে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করা।

হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) বলেছেন:
"যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে দৈনিক পাঁচ বার নামায আদায় করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভূক্ত নয়। যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়ারত থাকে না এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে খোদার স্মরণে মগ্ন থাকে না, সে আমার সম্প্রদায়ভূক্ত নয়।" *(আমাদের শিক্ষা, পৃ: ১৪)*

কুরআন

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَ
یُزَكِّیْهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۗ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ
لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۙ﴿۲﴾
وَّ اٰخَرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۳﴾

অনুবাদ

“তিনিই নিরক্ষরদের মাঝ থেকে তাদেরই একজনকে এক মহান রসূল করে আবির্ভূত করেছেন। সে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনায়, তাদের পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখায়। অথচ এর পূর্বে তারা নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় (পড়ে) ছিল। আর তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাঁকে আবির্ভূত করবেন), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়।”

[সূরা আল্ জুমু'আ: ৩-৪]

হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ} قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلاَثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ "لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلاَءِ"

অনুবাদ

“হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘একদা আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। ঠিক সেই সময়ে সূরা জুমু’আ অবতীর্ণ হলো। (যার একটি আয়াত হলো ‘এবং তিনি তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও তাঁকে আবির্ভূত করবেন, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি।) আমি রসূলে আক্‌রাম (সা.)-এর কাছে জানতে চাইলাম, এই সূরাতে উল্লেখিত অন্যরা কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ্? হযরত সালমান ফারসীও আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। আমি বার বার একই প্রশ্ন করায় রসূলুল্লাহ্ (সা.) সালমান ফারসীর উপর হাত রেখে বললেন, ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও উঠে যায় তথাপি এদের (পারস্য বংশীয়দের) এক বা একাধিক ব্যক্তি তা ফিরিয়ে আনবে।”

[বুখারী কিতাবুত্ তফ্‌সীর, সূরা জুমু’আ]

অমৃত বাণী

دنیا مجھے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں دنیا میں سے نہیں ہوں۔ مگر جن کی فطرت کو
اُس عالم کا حصّہ دیا گیا ہے وہ مجھے قبول کرتے ہیں اور کریں گے۔ جو مجھے چھوڑتا ہے
وہ اُس کو چھوڑتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جو مجھ سے پیوند کرتا ہے وہ اُس سے کرتا ہے
جس کی طرف سے میں آیا ہوں میرے ہاتھ میں ایک چراغ ہے جو شخص میرے پاس آتا ہے
ضرور وہ اُس روشنی سے حصہ لے گا مگر جو شخص وہم اور بدگمانی سے دور بھاگتا ہے
وہ ظلمت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس زمانہ کا حِصنِ حصین میں ہوں جو مجھ میں داخل ہوتا ہے
وہ چوروں اور قزّاقوں اور درندوں سے اپنی جان بچائے گا۔

(روحانی خزائن، جلد ۳، صفحہ ۳۴)

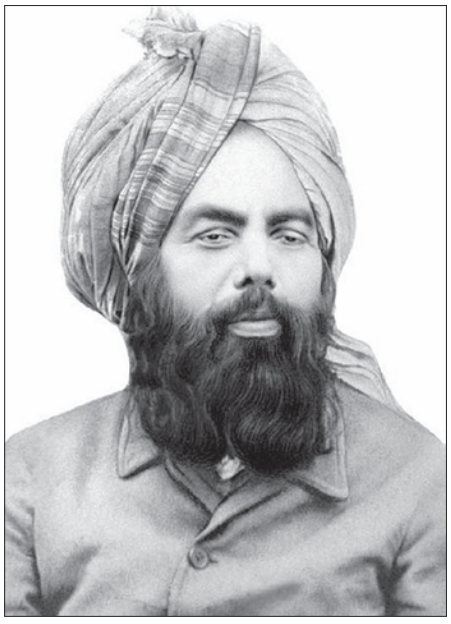

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)

"দুনিয়া আমাকে গ্রহণ করতে পারে না, কেননা আমি দুনিয়া হতে নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিক জগতের অংশ প্রদান করা হয়েছে তারা আমাকে গ্রহণ করেছে ও করবে। আমাকে যে ত্যাগ করে, সে তাঁকে ত্যাগ করে যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং যে আমার সাথে সংযোগ স্থাপন করে, সে তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করে যার পক্ষ হতে আমি এসেছি। আমার হাতে এক প্রদীপ আছে। যে ব্যক্তি আমার নিকট আসবে সে অবশ্যই সেই আলো হতে অংশ লাভ করবে কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণাবশতঃ দূরে সরে যাবে সে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে।"

[রুহানী খাযায়েন, খন্ড: ৩ পৃ: ৩৪]

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম: হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৪ই শাওয়াল ১২৫০ হি. মোতাবেক ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ খ্রি. রোজ শুক্রবার, ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা ও মাতা: তাঁর পিতার নাম - হযরত মির্যা গোলাম মুরতুযা সাহেব এবং মাতার নাম- হযরত চেরাগ বিবি সাহেবা।

প্রথম বিয়ে: হযরত মির্যা সাহেবের প্রথম বিয়ে পনের বা ষোল বছর বয়সে তাঁর মামাতো বোন হুরমত বিবি সাহেবার সাথে সম্পন্ন হয়।

শিয়ালকোট গমন ও খ্রিষ্টান পাদ্রীদের সাথে ধর্মীয় বিতর্ক: ১৮৬৪ সালে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতার আদেশে শিয়ালকোটে চাকুরীতে যোগদান করেন। সেই সময় তিনি খ্রিষ্টান পাদ্রীদের সাথে ধর্মীয় তর্কবিতর্কে লিপ্ত হয়ে ইসলামের পক্ষে জোরালো যুক্তির বলে পাদ্রীদের বিভিন্ন আপত্তির খণ্ডন করতেন। ১৮৬৭ সালে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ এই চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে কাদিয়ানে ফিরে আসেন।

প্রথম ইলহাম: হযরত মসীহ মওউদ আলায়হেস্ সালামের উপর প্রথম ইলহাম হয় ১৮৬৫ সালে। আর তা হলো:

ثَمَانِيْنَ حَوْلًا اَوْ قَرِيْبًا مِّنْ ذَالِكَ اَوْ تَزِيْدُ عَلَيْهِ سِنِيْنًا وَ تَرٰى نَسْلًا بَعِيْدًا

অর্থাৎ- তোমার বয়স আশি বছর হবে বা দুই চার বছর কম বা বেশী, আর তুমি এত বয়স পাবে যে, পরবর্তী প্রজন্মকেও দেখতে পাবে। *(তাযকেরা, পৃ. ৭, ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত)*

পিতৃবিয়োগ ও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শান্তনার বাণী: ১৮৭৬ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পিতা মৃত্যু বরণ করেন। পিতার মৃত্যুতে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন এই ভেবে যে, এখন কিভাবে সংসার চলবে। ততক্ষনাৎ আল্লাহ্ তা'লা শান্তনার বাণী শুনান- اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ
অর্থাৎ- আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?

মামুরিয়্যাত বা প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার ইলহাম: ১৮৮২ সালের মার্চ মাসে তিনি (আ.) মামুরিয়্যাতের ইলহাম লাভ করেন। আর তা হলো- قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ
অর্থাৎ- তুমি বল, আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি এবং আমি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী।

বারাহীনে আহমদীয়া প্রণয়ণ: ইসলামের সত্যতার স্বপক্ষে দলীল উপস্থাপন করে তিনি 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড ১৮৮০ সালে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮১ সালে, তৃতীয় খন্ড ১৮৮২ সালে, চতুর্থ খণ্ড ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবাই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, দীর্ঘ তেরশত বছর ধরে ইসলামের সমর্থনে এমন পুস্তক কেউ লিখতে পারে নি।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে প্রথম মামলা: ১৮৭৭ সালে এক খ্রিষ্টান রালইয়া রাম হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্বেষবশতঃ একটি মামলা করে। এই মামলা 'ডাকখানার মামলা' নামে প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় বিয়ে: ১৮৮৪ সালের শেষের দিকে দিল্লীর বিখ্যাত সূফী বুযুর্গ খাজা মীর দারদ সাহেবের বংশের কন্যা হযরত নুসরত জাহান বেগম সাহেবার সাথে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় বিয়ে সম্পন্ন হয়।

মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী: ১৮৮৬ সালে তাঁকে নানান গুণে গুণান্বিত এক পুত্রের শুভসংবাদ দেয়া হয়। সেই পুত্রকে মুসলেহ মওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক) বলা হয়। আর তিনি হলেন হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)।

বয়াতের দশটি শর্ত: ১৮৮৯ সালের ১২ জানুয়ারীতে তিনি (আ.) 'তাকমীলে তাবলীগ' নামক ইশতেহারের মাধ্যমে তাঁর হাতে বয়াত গ্রহণের দশটি শর্ত ঘোষণা করেন।

প্রথম বয়াত গ্রহণ: ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ লুধিয়ানায় তিনি (আ.) প্রথম বয়াত গ্রহন শুরু করেন। প্রথম দিন চল্লিশ জন সদস্য বয়াত গ্রহন করেন এবং সর্ব প্রথম হযরত হেকীম মাওলানা নুরুদ্দীন (রা.) হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন।

'মসীহ মওউদ' হওয়ার দাবী: ১৮৯১ সালে আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে জানান, যে মসীহ নাসেরীর আগমনের অপেক্ষায় মুসলমান ও খ্রিষ্টানরা অপেক্ষমান তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর মসীহর দ্বিতীয় আগমনের অর্থ হলো, তার গুণে গুণান্বিত হয়ে অন্য কোন ব্যক্তির আগমন। আর সেই ব্যক্তি হলেন তিনিই অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)।

'ইমাম মাহদী' হওয়ার দাবী: ১৮৯১ সালের মাঝামাঝি সময়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) নিকট আরেকটি বিষয় উন্মোচিত করেন যে, **'মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী'** একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। তখন তিনি এই দাবী করেন, মসীহ ও মাহদী তিনিই। তাঁর (আ.) এই দাবী রসূলে করীম (সা.)-এর এই হাদীস দ্বারা সমর্থিত, যেখানে রসূলে করীম (সা.) বলেছেন–

لَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরিয়ম ভিন্ন কোন মাহদী নাই (ইবনে মাজা)।

প্রথম জলসা সালানা: ১৮৯১ সালে ২৭, ২৮, ২৯ ডিসেম্বর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রথম জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। এই ঐতিহাসিক জলসায় ৭৫ জন পুণ্যাত্মা অংশগ্রহণ করেন।

রাণী ভিক্টোরিয়াকে ইসলামের দাওয়াত: ১৮৯৩ সালে 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' পুস্তকের মাধ্যমে রাণী ভিক্টোরিয়াকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানান।

চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ: হাদীস শরীফে মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদীর আগমনের একটি লক্ষণ বর্ণিত আছে যে, মাহদীর সত্যতা স্বরূপ একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে। তাঁর দাবীর কিছুদিন পরেই ১৮৯৪ সাল অনুযায়ী ১৩১১ হিযরী সনের রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয়, যা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সত্যতার অনেক বড় দলীল।

সর্বধর্মীয় সম্মেলন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতুলনীয় বিজয়: ১৮৯৬ সালে ২৬,২৭,২৮ ডিসেম্বর লাহোরে সর্বধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যেখানে সব ধর্মের স্কলারগণ নিজ নিজ ধর্মের সৌন্দর্য্য ও শিক্ষা তুলে ধরেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের স্বপক্ষে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যা 'ইসলামী নীতি দর্শন' নামে প্রসিদ্ধ। যা মওলানা আব্দুল করীম শিয়ালকোটি সাহেব চমৎকার ভঙ্গিমায় পাঠ করে শুনান। সেখানে উপস্থিত সকলে উক্ত প্রবন্ধের ভূয়ষী প্রশংসা করে এবং এই প্রবন্ধকে সকল প্রবন্ধের উপর জয়যুক্ত বলে ঘোষণা দেয়।

কাদিয়ানে স্কুল ও পত্রিকার শুভ সূচনা: ১৮৯৮ সালে আহমদী শিশুদের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে কাদিয়ানে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয় যা আজ "তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল" নামে পরিচিত। একই বছর জামাতের প্রচার, সংবাদ ও সদস্যদের তরবীয়তের উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আল হাকাম' কাদিয়ান থেকে প্রকাশ করা হয়। উক্ত পত্রিকা ইতোপূর্বে অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে অমৃতসর থেকে প্রকাশ করা হতো।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর নামকরণ: ১৯০১ সালের প্রাক্কালে সরকারের পক্ষ থেকে আদমশুমারী করা হয়। তখন ইসলামের অন্যান্য ফিরকা থেকে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার লক্ষ্যে জামাতের নাম "আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত" রাখা হয়।

যিল্লী নবুওয়্যতের দাবী এবং খতমে নবুওয়্যতের ব্যাখ্যা: যদিও এরপূর্বে তাঁর (আ.) কিতাবসমূহে তাঁর যিল্লী বা বুরূযী নবুওয়াতের বিষয়টি উল্লেখ ছিল, কিন্তু ১৯০১ সালে মসীহ মওউদ (আ.) 'এক গালাতি কা ইযালাহ' পুস্তিকায় এই ঘোষণা দেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আঁ-হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতায় এবং তাঁর (সা.) আধ্যাত্মিক কল্যাণের বরকতে যিল্লী এবং বুরূযী নবুওয়তের মর্যাদা দান করেছেন। তিনি (আ.) এটিও বর্ণনা করেন যে, **খাতামান্নাবীঈন** অর্থ সর্ব শেষ নবী নয়। বরং 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্নাবীঈন'-এর অর্থ হলো, নবুওয়তের উৎকর্ষতার দিক থেকে তিনি (সা.) সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁর (সা.) অনুবর্তিতা ছাড়া কেউ নবুওয়তের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। আর তাঁর (আ.) এই ব্যাখ্যা সর্বজন স্বীকৃত বুযুর্গানে দ্বীনের অভিমত দ্বারা প্রমাণিত।

'মিনারাতুল মসীহ'-র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন: ১৩ই মার্চ ১৯০৩ সালে রোজ শুক্রবার মিনারাতুল মসীহর ভিত্তি প্রস্তর রাখা হয়। তবে অর্থ সংকটের কারণে মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে এই কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। পরবর্তীতে খেলাফতে সানীয়ার যুগে ১৯১৫-১৯১৬ সালের দিকে এই মিনারের কাজ সম্পূর্ণ হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ওসীয়্যত এবং বেহেশতী মাকবেরা প্রতিষ্ঠা: ১৯০৫ সালের শেষের দিকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অধিক হারে নিজ মৃত্যু সম্পর্কে ইলহাম লাভ করতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর হাতে আর অল্প সময়ই বাকী আছে। তাই তিনি (আ.) জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে 'আল ওসীয়্যত' পুস্তক রচনা করেন। সেই পুস্তকে তিনি জামাতকে তাঁর মৃত্যুর পর খেলাফতের ধারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুসংবাদ দেন। এছাড়াও তিনি সেই ওসীয়্যতে খোদা তা'লার আদেশে জামাতের জন্য একটি বিশেষ মাকবেরার (কবরস্থান) প্রস্তাব রাখেন, যার নাম তিনি (আ.) 'বেহেশতী মাকবেরা' রাখেন।

সিলসিলাহ আহমদীয়াতে আলেম সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদরাসা আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা: ১৯০৬ সালে জামাতে আহমদীয়াতে উৎকৃষ্ট আলেম সৃষ্টির লক্ষ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মাদরাসা আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীতে 'জামেয়া আহমদীয়া'-তে রূপান্তরিত হয়।

সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা: ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে বেহেশতী মাকবেরা সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে হরযত মসীহ মওউদ (আ.) সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

সর্বশেষ পুস্তক রচনা: ২৫শে মে ১৯০৮ সালে তিনি (আ.) তাঁর সর্বশেষ পুস্তক 'পয়গামে সুলেহ' রচনা সম্পূর্ণ করেন। এই পুস্তকে তিনি ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যবস্থাপত্র প্রস্তাব করেন।

ইন্তেকাল: ১৯০৮ সালে ২৫শে মে দিবাগত রাতে তিনি (আ.) ভীষণ অসুস্থ হন। পরদিন অর্থাৎ ২৬শে মে সকাল সাড়ে দশটার দিকে তিনি এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে তাঁর প্রিয় প্রভূর সন্নিকটে উপস্থিত হন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

সন্তানের তরবিয়তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আদর্শ

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! আমাদের জীবনসঙ্গিনী এবং আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের চোখের মণি (স্নিগ্ধতা) বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম (অগ্রগামী) বানিয়ে দাও।' *(সূরা ফুরকান ২৫ঃ৭৫)*

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন– "কোন মহিলাকে বিয়ে করতে গিয়ে মূলতঃ চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়। তার সম্পদ দেখা হয়, না হয় তার পারিবারিক মর্যাদা দেখা হয়, না হয় তার রূপ সৌন্দর্য্য দেখা হয়, আর না হয় তার ধার্মিকতা দেখা হয়। এই চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে কোন মহিলাকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু তোমার উচিৎ ধর্মের দিকটাকে প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহ্ তা'লা মঙ্গল করুন, তুমি ধার্মিক মহিলা পাও"। *(বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন ঃ
"আমি মানুষের সন্তান লাভের আগ্রহ দেখে আশ্চর্য হই, কে জানে সন্তান কেমন হবে। যদি সন্তান ন্যায়পরায়ণ হয়, মানুষের কিছু উপকার হবে। সন্তান যদি এমন হয় যার দোয়া আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় তাহলে পরকালে উপকৃত হতে পারে।.... সন্তান লাভের আকাঙ্খা কেবল তখনই সঠিক হবে যখন সন্তান ন্যায়পরায়ণ হবে। আল্লাহ্র অনুগত বান্দা (দাস) হবে"। (মলফুযাত ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন ঃ
"সন্তান লাভের আকাঙ্খা কেবল এই নিয়্যতে হওয়া উচিৎ যে, সে ধার্মিক হবে, মুত্তাকী তথা খোদাভীরু হবে, খোদার অনুগত হয়ে ধর্মের সেবক হবে।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন ঃ
"কেউ যদি বলে যে, আমি সৎকর্মশীল, খোদাভীরু, ধর্মের সেবক সন্তান কামনা করি; তাহলে তাকে নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। কিন্তু সে যদি নিজের আমলে পরিবর্তন না আনে তাহলে সেটি কেবল তার মৌখিক দাবি হবে। যদি সে মুখে বলে ন্যায় পরায়ণ সন্তান চাই কিন্তু সে নিজে অবাধ্যতা, নাফরমানি এবং গুনাহময় জীবন যাপন করে তাহলে সে নিজের দাবিতে মিথ্যাবাদী। সৎকর্মশীল ন্যায়পরায়ণ মুত্তাকী সন্তান লাভের আকাঙ্খা করার পূর্বে তার নিজের মধ্যে সংশোধন আনা আবশ্যক"। *(মলফুযাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬০-৫৬১)*

তিনি (আ.) বলেছেনঃ
"যদি কেউ সন্তান নিতে চায় তার উচিত নিয়্যত করা এবং এই দোয়া করা "وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا"

অর্থাৎ আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম (অগ্রগামী) বানাও। এমন নিয়্যত করলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর মত সন্তান দান করার ক্ষমতা রাখেন"। (মলফুযাত ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৭৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সীরাত পাঠ করলে দেখা যায় সেখানে এমন উদাহরণ আছে যে, একজনের সন্তান ছিল না কিন্তু হযরত (আ.)-এর কথামত তওবা করার পর তিনি নেক সন্তান লাভ করেছেন।

হযরত (আ.) বলেছেন– সন্তান লাভের দোয়ার ক্ষেত্রে কেবল ধার্মিক ও ধর্মের সেবক সন্তান লাভের দোয়া করা উচিত। এমন মহিলাকে বিয়ে করবে যার বেশি সন্তান হয় এবং সত্যিকার অর্থে ধর্মের সেবক সন্তান যেন হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আদর্শ এবং তাঁর উপদেশ এই যে, বাবা মায়ের একান্ত ইচ্ছা থাকতে হবে, প্রবল আকাঙ্খা থাকতে হবে যেন নেক সন্তান লাভ হয়। তারপর বাবা-মা সবসময় সৎকর্ম এবং ইবাদতকে প্রাধান্য দিবে। আর নিজ সন্তানের জন্য দোয়া করে যাবে যে, ইয়া আল্লাহ্! আমার সন্তান যেন ন্যায়পরায়ণ, ইবাদতগুযার, ধর্মের সেবক হয়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়া কবুল করেছেন। আহমদীদের দোয়াও আল্লাহ্ কবুল করেন। কেউ যদি কেবল আকাঙ্খা করে আর মুখে বলে যে, নেক সন্তান চাই অথচ সময়মত নামায পড়ে না, নফল নামাযে দোয়া করে না তাহলে বেশি কিছু আশা করা যায় না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সকল সন্তানের জন্মের পূর্বেই আল্লাহ্ ইলহাম করে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন। তারপরও হযরত (আ.) সবসময় দোয়া করতেন।

তিনি (আ.) বলেছেন– "আমার তো অবস্থা এই যে, এমন কোন নামায নেই যেখানে আমি বন্ধুদের জন্য, নিজ সন্তানদের জন্য এবং আমার স্ত্রীর জন্য দোয়া করি না।" *(মলফুযাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৬২)*

হযরত আকদাস (আ.) রচিত কবিতার মাঝে অনেক দোয়ার কথা আছে,

سب کام تو بنائے لڑکے بھی تجھ سے پائے
سب کچھ تیری عطاء ہے گھر سے تو کچھ نہ لائے

তুমি আমার সমস্ত কাজ করে দিয়েছ, পুত্র সন্তানও তোমা থেকে পেয়েছি,
সবই তোমার দান- নিজ গৃহ থেকে তো কিছুই আনি নি।

تو نے ہی میرے جانی خوشیوں کے دن دکھائے
یہ روز کر مبارک سُبْحٰنَ مَنْ یَّرَانِیْ

তুমিই আমাকে আমার খুশির দিন দেখিয়েছ,
এ দিন মোবারক কর হে পবিত্রতম! যিনি আমাকে দেখছেন।

کر ان کو نیک قسمت دے ان کو دین و دولت
کر ان کی خود حفاظت ہو ان پہ تیری رحمت

এদেরকে সৌভাগ্যবান বানাও এদেরকে দ্বীন ও দওলত দাও, তুমি (হে আল্লাহ্!) নিজেই এদের হেফাযত কর, এদের উপর তোমার রহমত হোক

دے رشد اور ہدایت اور عمر اور عزت
یہ روز کر مبارک سُبْحٰنَ مَنْ یَّرَانِیْ

এদেরকে সুবুদ্ধি, হেদায়েত, দীর্ঘায়ু এবং সম্মান দান কর,
এ দিন মোবারক কর হে পবিত্রতম! যিনি আমাকে দেখছেন।
(দূররে সমীন উর্দু)

হযরত (আ.) বলেছেন :
"সন্তানের জন্য মা-বাবার দোয়ার বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা আছে। ------ আমি বিশেষভাবে কয়েকটি দোয়া নিয়মিত করে থাকি। প্রতিদিন প্রথমত: নিজের জন্য দোয়া করি, হে খোদা আমার দ্বারা এমন কর্ম সম্পাদন করাও যদ্বারা তোমার সম্মান ও প্রতাপ প্রকাশ পায় এবং তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। দ্বিতীয়ত: আমার গৃহবাসিনীর (স্ত্রী) জন্য দোয়া করি যেন তাঁর কাছ থেকে সর্বদা পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করতে পারি এবং তিনি যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির পথে চলতে থাকেন। তৃতীয়ত: নিজ সন্তানের জন্য দোয়া করি তারা যেন সবাই ধর্মের সেবক (খোদ্দাম) হয়"। *(মলফুযাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৯)*

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানি (রা.) বর্ণনা করেছেন :
"হযরত (আ.) নিজ সন্তানদের সাথে যেমন ব্যবহার করতেন অন্যদের সাথেও তেমন ব্যবহার করতেন। আপন ও পরের পার্থক্য করতেন না"। *[সীরাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), পৃষ্ঠা: ৩৮৬]*

হযরত (আ.) নিজ সন্তানদেরকে আদব কায়দা শেখাতেন, এ সম্বন্ধে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) লিখেছেন :
"একদিন খেলার সময় তিনি (মিয়া বশীর) মির্যা নিযাম দ্বীন সাহেবের বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, ঐ দেখ মির্যা নিযাম দ্বীনের বাড়ি। একথা শোনা মাত্র হযরত (আ.) নিজ সন্তান হযরত মিয়া বশীরকে নিষেধ করে বললেন, তিনি তোমার চাচা। এভাবে তাঁর নাম উচ্চারণ করো না। মির্যা নিযাম দ্বীন হযরত (আ.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন এবং তিনি হযরত (আ.)-এর বড় শত্রু ছিলেন। হযরত (আ.)-কে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। এমনকি শেষ পর্যায়ে হযরত (আ.)-এর প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। *(সীরাতুল মাহ্দী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮, রেওয়ায়েত নম্বর ৩৮)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড় মেয়ে হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) লিখেছেন ঃ
"নবাব আমাতুল হাফিজ বেগম [হযরত (আ.)-এর ছোট মেয়ে] অনেক ছোট ছিলেন। কোন মূর্খ চাকরাণীর মুখ থেকে একবার একটি গালি শুনেছিলেন। হযরত (আ.)-এর সামনে তিনি ঐ গালি উচ্চারণ করেছিলেন। হযরত (আ.) তা শুনে খুব অসন্তুষ্ট হন আর বলেন, ছোট্ট বয়সে কোন শব্দ যদি কোন শিশুর মাথায় একবার স্থান করে নেয় তাহলে সেটি সংরক্ষিত হয়ে যায়, অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত তা তার মাথায় থেকে যায়। শিশুদের কোন মন্দ কথা যেন কখনো শেখানো না হয়।" *(তাহরিরাতে মোবারেকা, পৃষ্ঠা: ২৮৯)*

হযরত নবাব মোবারেকা বেগম (রা.) লিখেছেন :
"আব্বাজান [মসীহ্ মওউদ (আ.)] দোয়ার উপর খুব জোর দিতেন। সেকথা আমার খুব স্মরণ আছে। এমন মনে হয় যে, হযরত (আ.)-এর এটিও একটি জরুরী কর্তব্য ছিল। আমাকে অনেক সময় বলতেন, রাতে যখনই তোমার ঘুম ভাঙ্গে তুমি দোয়া করবে। এটি তোমার তাহাজ্জুদ হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত আমার এই অভ্যাস রয়ে গেছে। যখনই রাতে ঘুম ভাঙ্গে আমার মুখে দোয়া এসে যায়।" *(তাহরিরাতে মোবারেকা, পৃষ্ঠা ২১৭)*

হযরত মোবারেকা বেগম লিখেছেন:
"আমি খুব ছোট দিলাম, হযরত (আ.) অনেক সময় তাঁর কাজের জন্য আমাকে দোয়া করতে বলতেন। চিন্তা করুন, তিনি কত বড় বুযুর্গ আর আমি কত ছোট খুকি। তারপরও আমাকে দোয়ার জন্য বলতেন। তিনি চাইতেন আমরাও যেন দোয়া করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। *(তাহরিরাতে মোবারেকা, পৃষ্ঠা: ৬৬)*

হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) আরো বলেন– "অনেক সময় কোন কারণে বা অসুস্থ্যতার কারণে উঠতে পারি না, কিন্তু অভ্যাস মত দোয়া করি। দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ি"। *(তাহরিরাতে মোবারেকা, পৃষ্ঠা ২৭০)*

হযরত (আ.) শিশু সন্তানদের কাশ্‌ফ বা সত্য স্বপ্নকে গুরুত্ব দিতেন। হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) বলেছেন, 'আমি স্বপ্ন দেখে হযরত (আ.)-এর কাছে বর্ণনা করেছি। হুযুর (আ.) তাঁর নোট বুকে তা লিখে নিয়েছেন।' *(বারাকাতে খেলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮১)*

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.)-ও এমন কথাই লিখেছেন যে, 'হযরত আকদাস (আ.) ছোটদের স্বপ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং লিখে নিতেন।' *(সীরাতুল মাহ্‌দী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:২৩, রেওয়ায়েত নম্বর ৩০)*

হযরত (আ.) অল্প বয়সে শিশুদের রোযা রাখতে দিতেন না। একবার হযরত নবাব মোবারেকা বেগম (রা.) রোযা রেখেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ১০ বছর। হযরত (আ.) যখন জানতে পারলেন তখন তাঁর রোযা খুলে দিলেন। তাঁর সাথে তাঁর সাথী সালেহা বেগমকেও রোযা খুলে ফেলতে বললেন। *(তাহ্‌রিরাতে মোবারেকা, পৃষ্ঠা:২১৩)*

ছোট ছেলেমেয়েরা ভুল করলে মারপিট করা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) সঠিক মনে করতেন না। হযরত (আ.) বলেছেন– "শিশুদের মারধর করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। মারধর করে তরবিয়ত করার চেষ্টার অর্থ নিজেকে রুবুবিয়্যাতের অংশীদার মনে করা। (রব্ব অর্থাৎ রবুবিয়্যাত আল্লাহ্‌র এখতিয়ার) শাস্তি দেয়ার চিন্তা না করে যদি সে দোয়ারত হয় আর আল্লাহ্‌র দরবারে বিগলিতচিত্তে ও কেঁদে কেঁদে দোয়া করে তাহলে ভাল হয়। **আল্লাহ্ তা'লার কাছে সন্তানদের পক্ষে বাবা মায়ের দোয়াকে গ্রহণযোগ্যতা দেয়া হয়েছে।**" *(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৮-৩০৯)*

শিশুরা বাল্যকালে বাবা মাকে অনেক প্রশ্ন করে আর বার বার প্রশ্ন করে। অনেক সময় বাবা-মা অধৈর্য্য হয়ে ধমক দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ধৈর্য্যের সাথে শিশুদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কখনো বিরক্ত হতেন না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সন্তানদেরকে মুসলমান বুযুর্গগণের ঐতিহাসিক ঘটনা শোনাতেন। *(সীরাতে তাইয়্যেবা, হযরত মির্যা বশীর আহমদ, পৃষ্ঠা: ৩৬ ; সীরাত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), লেখক মৌলভি আব্দুল করীম শিয়ালকোটী, পৃষ্ঠা: ৭৩)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র জীবনে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যা ঈমানবর্ধক ও তরবিয়তমূলক, কিন্তু এত ছোট প্রবন্ধে এর বেশি বর্ণনা করা সম্ভব না। হযরত (আ.)-এর মূল অস্ত্র ছিল দোয়া। শুধু তরবিয়তের জন্য নয়, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার এবং বিধর্মীদের সাথে ধর্মযুদ্ধের ময়দানে জয় লাভ করা এবং তাঁর (আ.)-এর শত্রুদের বিপক্ষে জয়যুক্ত হওয়ার একমাত্র অস্ত্র ছিল দোয়া। উঠতে-বসতে, শয়নে-জাগরণে সবসময় সকল কিছুর জন্য তিনি দোয়া করতেন। আমাদের কর্তব্য হযরত (আ.)-এর জীবনী পাঠ করা এবং তাঁর বই পড়া।

হযরত (আ.)-এর আরো দু-একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এখানেই শেষ করছিঃ হযরত (আ.) বলেছেন– "সন্তানদের মেহমান মনে করা উচিত। খুব আদর যত্ন করা উচিত। তাদের মন রক্ষা করা উচিত কিন্তু খোদা তা'লাকে সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। সন্তান কী দিতে পারে? খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করা আবশ্যক"। *(মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪১৯)*

পরিবেশ অনেক বড় বিষয়। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। কাদিয়ানের পরিবেশ আহমদীদের জন্য সহায়ক ছিল। আহমদীরা ছিলেন, ভিন্নধর্মাবলম্বীগণ ছিলেন। আহমদীদের পরিবেশ ভিন্ন ছিল। আমাদের বাড়ি বা মহল্লার পরিবেশ সেরকম বানাতে হবে। আহমদীদের নিয়মিত মসজিদে যেতে হবে। মসজিদ না থাকলে নিজ বাড়ি বা বাসায় ওরকম পরিবেশ বানাতে হবে। নিয়মিত বাজামাত নামায আদায় করতে হবে এবং ফজরের পর, মাগরিবের পর ও এশার পর দরসের ব্যবস্থা করতে হবে। এম.টি.এ দেখার ব্যবস্থা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামাযের জন্য সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলতেন– "নামাযগুলো খুব সুন্দর করে মনোযোগ সহকারে পড়বে"। *(সীরাতুল মাহ্‌দী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৬)*

হযরত (আ.) আরো বলেছেন– "কারো যদি সালেহ্ (সৎকর্মশীল, ন্যায়পরায়ণ) সন্তান হয়ে থাকে, তার তো কোন দু:চিন্তা থাকতে পারে না। খোদা তা'লা স্বয়ং বলেছেন :

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

'তিনি সালেহীনদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন।' অর্থাৎ খোদা তা'লা সালেহ্‌গণের (পুণ্যবানদের) সকল দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু সন্তান যদি হতভাগ্য বা দুর্ভাগা হয় তাহলে লক্ষ টাকা তার জন্য রেখে গেলেও সে ঐ সমস্ত টাকা অপকর্মে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়ে রিক্ত হস্ত হয়ে যাবে এবং বড় বিপদ ও কঠিন পরিস্থিতিতে পড়বে- এটি তার জন্য অবধারিত। *(মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৪৪)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন: "হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা সন্তানদের পক্ষে বাবা মা'র দোয়া কবুল করেন।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে দোয়ারত থাকার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

হযরত খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মদ (সা.)-এর দিব্য দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের শুভ সংবাদ।

আলহাজ্জ মাওলানা সালেহ্ আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ অর্থাৎ নবীদের সত্যতার মানদণ্ড হিসেবে অদৃশ্যের সংবাদ প্রাপ্তি ও প্রদানকে, তাদের সত্যতার এক অকাট্য প্রমান হিসেবে নির্ণয় করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝
إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ
مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝

অর্থাৎ (তিনি) অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত! আর তিনি কাউকে তাঁর অদৃশ্য জগতের কর্তৃত্ব দান করেন না। কেবল তাকে ছাড়া যাকে তিনি (তাঁর) রসূলরূপে মনোনীত করেন। আর তাঁর সামনে ও তাঁর পিছনে (ফেরেশ্তারা) প্রহরীরূপে চলছে। *(সূরা আল জিন্: ২৭-২৮)*

নবীদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান প্রদানের মাধ্যম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن
وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ
مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

অর্থাৎ আর কোন মানুষের এ যোগ্যতা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে (সরাসরি) কথা বলবেন, তবে কেবল ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা কোন বার্তাবাহক পাঠানোর মাধ্যমে, যে তাঁর আদেশানুযায়ী তা-ই ওহী করে যা তিনি চান। নিশ্চয় তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাবান (ও) পরম প্রজ্ঞাময়। *(সূরা আশ্ শুরা: ৫২)*

অর্থাৎ নবীগণ ওহী, ইলহাম, সত্য স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনের মাধ্যমে অদৃশ্যের সংবাদ লাভ করে থাকেন।

আলেমুল গায়েব অর্থাৎ অদৃশ্য ও ভবিতব্য, সব বিষয়াদী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আল্লাহ্র কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে কেবল নবীগণই মানব জাতির কাছে তা উপস্থাপন করেন। এ পৃথিবীতে অনেক এমন লোক রয়েছে যারা নবীদের যুগে অথবা তাদের গত হয়ে যাবার পরবর্তী সময়ে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার কথা বলে দাবী করে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকে। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মিথ্যা ও ভুল বলে প্রমাণিত হয়। তবে জেনে রাখা আবশ্যক, অদৃশ্য বিষয়ের যে সব জ্ঞান নবীগণকে দেয়া হয়, ঐগুলোর প্রকৃতি, ব্যাপকতা, গভীরতা, গুরুত্ব, বিশ্বস্ততা ও জনকল্যাণ-মুখিতা এবং বিশেষ করে ওহী-ইলহামকে প্রক্ষেপমুক্ত ও অবিকৃত অবস্থায় রাখা ও এর রক্ষা করা ইত্যাদি গুণাবলী এমনি অতুলনীয় যা অন্য সব জ্ঞান হতে স্বতন্ত্র ও অনন্য। ওহী ইলহাম অর্থাৎ অদৃশ্যের সংবাদ দাতা ও এর নিয়ন্ত্রনকর্তা আল্লাহ্ তা'লা। তাই তিনি অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকে নবীদের সত্যতার মানদণ্ড হিসেবে নির্ণয় করেছেন এবং এসবের পূর্ণতার মাধ্যমে নবীদেরকে তিনি শত্রুদের ওপর বিজয় প্রদান করে থাকেন।

সাইয়্যেদুল আম্বিয়া নবী করীম (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা 'বশীর' অর্থাৎ– সুসংবাদদাতা এবং 'নযীর' অর্থাৎ– সতর্ককারী উপাধীতে ভূষিত করেছেন। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সাথে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনাবলী এবং কোন কোন ঘটনার অংশবিশেষ আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) সত্য স্বপ্ন ও কাশ্ফের (দিব্যদর্শন) মাধ্যমে এভাবে দেখিয়েছেন যে, মানুষ আশ্চার্যান্বিত হয়ে যায়, আর ভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর কথাগুলো এভাবে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে পারে!

যেমন একবার কসুফের নামাযের মধ্যে মহানবী (সা.)-কে দিব্যদর্শনে একটি দৃশ্য দেখানো হয়। নামাযের পর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন নামাযের মধ্যে আপনি একবার এগিয়ে গেলেন আরেকবার পিছনে আসলেন এর কারণ কি? তিনি (সা.) বললেন, নামাযের মধ্যে আমাকে এখানে ভবিষ্যতের সেসব দৃশ্য দেখানো হয়েছে যা সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এমন কি আমাকে জাহান্নাম ও জান্নাত দেখানো হয়েছে। এ দিব্যদর্শন এতো স্বচ্ছ ও বাস্তব ছিল, জান্নাতের নেয়ামত সমূহ থেকে কিছু নেয়ার জন্য তিনি (সা.) এগিয়ে যান এবং জাহান্নামের ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে তিনি পিছিয়ে যান। *(বুখারী কিতাবুল কুসুফ)*

মহানবী (সা.)-এর অনেক রুইয়া (সত্য স্বপ্ন) ও কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শন) হাদীসের গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। এ সব বিষয়ের বর্ণনা পড়লে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ জানা যায়। তাঁর এ সব রুইয়া ও কুশুফকে কয়েকভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কিছু যা তাঁর (সা.)-এর জীবনে হুবহু পূর্ণতা লাভ করেছে আর কিছু রুইয়া ও কুশুফ তাঁর (সা.)-এর জীবনে তা'বীরী অর্থে অর্থাৎ ব্যাখ্যা মূলক অর্থে পূর্ণ হয়েছে। কিছু রুইয়া ও কুশুফ তা'বীরী অর্থে প্রকাশিত ও পূর্ণ হবার পর মহানবী (সা.) এর অর্থ বুঝতে পেরেছেন। নতুবা তাবীরী অর্থে প্রকাশিত হবার পূর্বে তিনি (সা.) এর অর্থ অন্য কিছু বুঝেছিলেন। আর কিছু রুইয়া ও কুশুফ যেগুলো সম্পর্কে তিনি (সা.) নিজ উম্মতকে অবগত করে গেছেন যা তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে বা হবে বা হতে থাকবে। তা হতে এখানে কয়েকটি লিপিবদ্ধ করছি।

অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ও সত্যস্বপ্ন মহানবী (সা.)-এর জীবনে হুবুহু অর্থাৎ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে তাঁর বিবাহ। বিয়ের পূর্বেই হযরত আয়েশা (রা.)-এর ছবি দেখিয়ে বলা হয়েছে ইনি হলেন তোমার স্ত্রী। এ সত্ত্বেও তিনি (সা.) এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করলেন এবং বললেন এ রুইয়া যদি বাস্তবেই পূর্ণ হবার থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এর ব্যবস্থা করে দিবেন। (বুখারী কিতাবুন্ নিকাহ্)। পরবর্তিতে প্রতিকুল অবস্থা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এ বিয়ে সম্পন্ন হয়।

মহানবী (সা.)-এর কিছু ভবিষ্যদ্বাণী ও রুইয়া এমন ছিল যা তাঁর (সা.) জীবদ্দশায় পূর্ণ হয়েছিল তবে তা বাহ্যিক ভাবে হুবহু পূর্ণতা লাভ করেনি বরং তা তা'বীরী রূপে অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক অর্থে পূর্ণতা লাভ করেছে। এরূপ অনেক ভবিষ্যদ্বাণী ও রুইয়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, উহুদ যুদ্ধের পূর্বে মহানবী (সা.) দিব্যদর্শনে কয়েকটি গাভী জবাই করার দৃশ্য দেখেন, নিজে তরবারী চালাচ্ছেন এবং এই তরবারীর অগ্রভাগ ভেঙ্গে যাওয়ার দৃশ্য দেখেছেন। (বুখারী কিতাবুত তা'বীর) মহানবী (সা.) -এর এ দিব্যদর্শন উহুদের যুদ্ধে সত্তর (৭০) জন মুসলমানের শাহাদত, মহানবী (সা.)-এর দাঁত শহীদ হওয়া এবং তাঁর আহত হবার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে।

মহানবী (সা.)-এর কিছু রুইয়া ও কুশুফ এমন রয়েছে, যেসবের তা'বীর তিনি (সা.) যা মনে করেছিলেন পরবর্তীতে তা ভিন্নতর রূপে তাঁর জীবনে পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন মহানবী (সা.)-কে কাশ্‌ফে খেজুর গাছ বিশিষ্ট স্থানকে দারুল হিজরত রূপে দেখানো হয়েছে। তিনি (সা.)-এর অর্থ করেছিলেন ইয়ামামা। পরবর্তীতে তা মদীনা রূপে প্রমাণিত হলো। *(বুখারী কিতাবুত তা'বীর)*

মহানবী (সা.)-এর কিছু রুইয়া (সত্য স্বপ্ন) যা প্রাথমিকভাবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে হয়েছে কিন্তু তিনি (সা.) পরবর্তিতে বুঝতে পারলেন, এ রুইয়া তাঁর (সা.) মৃত্যুর পর প্রকাশিত হবে। তখন তিনি (সা.) তদনুযায়ী এসব ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর (সা.) উম্মতকে জানালেন। তাঁর (সা.)-এর মৃত্যুর পর এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে। যেমন, মহানবী (সা.) বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার হাতে সোনার দু'টি কংকন আর আমি তা অপছন্দ করে কেটে ফেললাম। এর পর আমাকে আদেশ দেয়া হলো, আর আমি এ দুটিতে ফুঁ দিলাম আর সে দুটি উড়ে গেলো। আমি এর তা'বীর করলাম দু'জন মিথ্যাবাদী আমার পর প্রকাশিত হবে।' উবায়দুল্লাহ্ বলেন, এর দ্বারা আস্‌ওয়াদ আনসি এবং মুসায়লেমা কায্‌যাব কে বুঝানো হয়েছে। *(বুখারি কিতাবুল মাগাযি ওয়া কিতাবুত্ তা'বীর)*

একবার মহানবী (সা.) বললেন 'আমাকে পৃথিবীর সম্পদের চাবি দেয়া হয়েছে। এমনকি সেগুলোকে আমি আমার দেখেছি।' হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পর আমরা ঐ সম্পদগুলো অর্জন করছি। *(বুখারি কিতাবুত্ তা'বীর)*

মহানবী (সা.)-এর কিছু কাশ্‌ফ ও রুইয়া এমন রয়েছে যা আখেরী যামানার সাথে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে কিছু সতর্ককারী সংবাদ এবং সুসংবাদও রয়েছে। মহানবী (সা.)-কে এগুলোর তা'বীর সম্পর্কে জ্ঞাত করা হয়নি এবং তিনি (সা.) নিজেও এর তা'বীর বর্ণনা করেন নি। তবে পরবর্তী যুগে এসব ভবিষ্যদ্বাণীর তা'বীর প্রকাশিত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে। যেমন, মহানবী (সা.) রুইয়াতে মসীহ্ মওউদ এবং দাজ্জালকে কাবা গৃহের তাওয়াফ করতে দেখেছেন। *(বুখারী কিতাবুত তা'বীর)*

অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, দাজ্জাল মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। এজন্য উম্মতের আলেমগণ এই কাশ্‌ফের তা'বীর এই করেছেন যে, দাজ্জালের কাবা গৃহের তাওয়াফ করার অর্থ হলো ইসলামের ক্ষতি সাধন করা ও ধ্বংস করার চেষ্টা করা। আর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাবা গৃহের তাওয়াফ করার অর্থ হলো কাবা গৃহ ও ইসলামের নিরাপত্তা বিধান করা। *(মাযাহেরুল হাক্কে, শারাহ্ মিশকাতুল মাসাবিহ, চতুর্থ খন্ড, ৩৫৯ পৃ)*

সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ এবং ইমাম মাহদী (আ.) দ্বারা ইসলামের নিরাপত্তা বিধানের যে সুসংবাদ মহানবী (সা.) দিয়ে গিয়েছিলেন আজ তা আহমদীয়া মুসলিম জামাত দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। আর কাবা গৃহের নিরাপত্তা তাও আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের হৃদয় নিংড়ানো দোয়া দ্বারা হচ্ছে।

মহানবী (সা.)-কে তাঁর উম্মতের আধিক্য, মর্যাদা ও প্রাচুর্য্যের দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। তিনি (সা.) বলেন, "আমার

উম্মতের আধিক্য দেখে আমি আশ্চার্যান্বিত হয়েছি। তাদের দ্বারা (হাশরের) ময়দান ভরে গেছে।" *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল , প্রথম খন্ড, পৃ: ৩-৮)*

তিনি (সা.) উম্মতের এমন সৌভাগ্যবানদের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন যারা হিন্দুস্তানে জিহাদ করবে এবং আরো এক দলের কথা তিনি (সা.) আমাদের জানিয়েছেন যারা মসীহ মওউদ -এর সঙ্গী হবে। *(নিসাই কিতাবুল জিহাদ)*

এ ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথমাংশ ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মদ বিন কাশেম এর মাধ্যমে সিন্ধু প্রদেশের বিজয় দ্বারা উপমহাদেশের বিজয় শুরু হয়। তিনি সিন্ধুর অত্যাচারী রাজার হাত থেকে সেখানকার লোকদেরকে উদ্ধার করেন এবং সেখানে শান্তি এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। তার উত্তম ব্যবহারে এবং উত্তম আচরনের কারণে সেখানকার অধিবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

এ ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশের সম্পর্ক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের সাথে। সে যুগে সৌভাগ্যবানদের এক দল হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর নেতৃত্বে ধর্মের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা ও জান মালের কুরবানী দিবে। তাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করে তাদেরকে নিজের ভাই বলে সম্বোধন করেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, দ্বিতীয় খন্ড) এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে 'তারা আমাকে দেখেছে এবং আমার ভালোবাসায় তারা বড় বড় কুরবানি করবে। (মুসনাদে দারেমী , কিতাবুর রিকাক)। তিনি (সা.) আরো জানিয়েছেন, 'মসীহ মাওউদের যামানায় আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মের অসাড়তা প্রমাণ করে দিবেন এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠিকে মিটিয়ে দিবেন। *(আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম)*

ইসলামের মহা বিজয়ের সংবাদ তিনি, এভাবে দিয়ে গেছেন 'আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলকে আমার জন্য গুটিয়ে দেখিয়েছেন।' এর তা'বীর সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন, আমার উম্মত পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে অবশ্যই রাজত্ব লাভ করবে, আর তা আমাকে দিব্যদর্শনে দেখানো হয়েছে। (মুসলিম, কিতাবুল ফিতন্)

আগামীতে এ ভবিষ্যদ্বাণী কি রূপে পূর্ণ হবার ছিল সে দৃশ্য আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে খন্দকের যুদ্ধে দেখিয়ে ছিলেন। সাহাবারা সবাই ক্ষুধার্ত, খাদ্য নেই। সে সময় মহানবী (সা.)-এর পেটে তিনটি পাথর বাঁধা। কাফের ও মুনাফেকদের মরণ-কামড়, এর বিপক্ষে মহানবী (সা.) আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে প্রতিরক্ষা গড়ে তুলছিলেন। সবাই ক্লান্ত। সে সময় একটি বড় পাথর ভাঙ্গতে অপারগ হয়ে সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (সা.)-এর শরণাপন্ন হন। তিনি (সা.) বললেন, এর ওপর পানি ফেল। এরপর মহানবী (সা.) কোদাল দিয়ে আঘাত করেন, পাথরের একাংশ ভেঙ্গে গেল। মহানবী (সা.) উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বললেন। তিনি (সা.) বললেন, সিরিয়ার চাবি আমার হাতে দেয়া হয়েছে, খোদার কসম! সিরিয়ার লাল রংয়ের প্রাসাদসমূহ আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। এরপর দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন, পাথরের আরেকাংশ ভেঙ্গে গেল। তিনি (সা.) উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বললেন আর সাহাবাদের জানালেন, ইরানের চাবি আমার হাতে দেয়া হয়েছে এবং আমি মাদায়েনের সাদা রংয়ের প্রাসাদ সমূহ এখান থেকে আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি (সা.) তৃতীয়বার পাথরটির ওপর আঘাত করলেন আর পাথরটি টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তিনি (সা.) পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বললেন । সাহাবীদের বললেন ইয়ামানের চাবি আমাকে দেয়া হয়েছে। খোদার কসম! সানা শহরের প্রাসাদ সমূহ আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, দ্বিতীয় খন্ড , পৃ: ৩০৩)*

এ এক মহান আধ্যাত্মিক দিব্যদর্শন ছিল। একদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত, খাদ্যাভাবে পেটে পাথর বাঁধা এবং জীবন সংকটাপন্ন , সে সময়ে ঐশী অঙ্গীকার অনুযায়ী সাহাবাদেরকে মহান দুটি সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হবার সংবাদ দিচ্ছেন। আল্লাহ্র উপর অগাধ বিশ্বাস রাখলে পরেই এমনটি হওয়া সম্ভব।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং হযরত আবূ উবায়দা (রা.)-এর দ্বারা ইসলামী সেনাদল সিরিয়া বিজয় করে। হযরত ওমর (রা.)-এর যূগে এ বিজয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস এর নেতৃত্বে ইরান মুসলমানদের করতলগত হয়। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের দুটি শক্তিধর সাম্রাজ্য রোম ও ইরান মুসলমানদের হস্তগত হয়।

মুসলমানদের চরম অধঃপতন ও বিপদের সময় মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকে আশ্বস্ত করে বলেছেন 'তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে, যখন ইবনে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন এবং তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের ইমাম হবেন। (বুখারী বাব: নুযূলে ঈসা)। তিনি (সা.) বলে গেছেন, মাহদী ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে অপর কেউ নন। *(ইবনে মাজা, বাবু শিদ্দাতুয্ যামান)*

আজ আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার চরম বিপদ ও অধঃপতনের সময় মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে ঈসা সদৃশ করে পাঠিয়েছেন এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর (আ.)-এর জামাত দ্বারা অন্যান্য ধর্মাবলীর উপর ইসলামের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছেন।

মহানবী (সা.) বলে গেছেন 'যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে তাঁর হাতে বয়াত করবে, যদি বরফের ওপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল-মাহদী। *(সুনানে ইবনে মাজা, বাবু খুরুজুল মাহ্‌দী)*

মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আজ সারা বিশ্বে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামাত মহানবী (সা.)-এর পতাকা তথা ইসলামের বাণী প্রচার করে চলেছে আর অপর দিকে যাদের কাছে তিনি (সা.) এসেছেন তারা তাঁকে কাফের আখ্যা দিয়ে বিরোধীতা করে চলেছে এবং মুখের ফুৎকার দিয়ে এই ঐশী প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে চাইছে। তবে এরূপ হওয়া কখনও সম্ভব নয় কেননা এতো আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি।

ভাববার বিষয় হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। তবে কিছু তাঁর জীবদ্দশায়, কিছু তাঁর (সা.)-এর মৃত্যুর অনবহিত পরে এবং কিছু তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরে। এছাড়াও তাঁর (সা.) অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যা বিভিন্ন ভাবে পূর্ণ হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। কোনোটি তা'বীরের দিক থেকে, কোনোটি আক্ষরিক অর্থে আবার কোনোটি পূর্ণ হবার পর জানা যাচ্ছে ভবিষ্যদ্বাণীটি এ ভাবে পূর্ণ হবার ছিল। হযরত ঈসা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটিও পূর্ণ হবার ছিল, তবে হাঁ কেউ যদি হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি, ইহুদীদের এলিয়া নবীর আগমনের মত আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হবে বলে বিশ্বাস করে তবে তা কখনো পূর্ণ হবে না, যেভাবে ইহুদীদের জন্য তা পূর্ণ হয়নি। এলিয়া আসলেন এবং তাদের জানালেন যে, ভবিষ্যদ্বাণীটি আক্ষরিক অর্থে পুর্ণ হবার ছিল না বরং তা রূপক অর্থে পূর্ণ হবার ছিল কিন্তু ইহুদীরা তা মানল না এবং তারা অভিশপ্ত হয়ে গেল। কুরআন প্রতিদিন সুরা ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আমাদের স্মরণ করায় 'হে আল্লাহ্ তুমি আমাদের মাগযুবের পথে নিওনা'। অর্থাৎ ইহুদীদের পথে যেতে দিও না। তাই উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার দায়িত্ব হলো, হৃদয়ের চোখ খুলে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পড়া এবং তারপর হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পড়া। এরপর অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করা। তবেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে, হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে যা ভাবা হচ্ছে আসলে বিষয়টি তা নয়। হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী আসলে রূপক অর্থে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি আদেশ বুঝার এবং এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতকারী। (সুরা নুর : ৫৬)

কুরআন ও হাদীসের মাপকাঠিতে 'আগমনকারী ইমাম মাহ্‌দী (আ.)'-এর পদমর্যাদা

মাওলানা বশিরুর রহমান
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

কুরআন ও হাদীসের মাপকাঠিতে আগমনকারী ইমাম মাহদীর পদমর্যাদাকে বুঝার জন্য মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে আগমনকারী ইমাম মাহদীর অবস্থান কি ছিল সেটিকে বুঝতে হবে। মহানবী (সা.) মুসলমানদের শুভ সংবাদ দিয়ে বলেছিলেন:

يُوْشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ اَنْ يَلْقٰى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اِمَاماً مَهْدِيًّا

অর্থাৎ (হে মুসলমানগন) তোমাদের মধ্য থেকে যে জীবিত থাকবে সে ঈসা ইবনে মরিয়ম এর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি ইমাম মাহদী হবেন। *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)*

আগমনকারী ঈসা (আ.) -এর মাহদী হওয়া সম্পর্কে অন্য এক হাদীসে এসেছে:

لَا الْمَهْدِيُّ اِلَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ

অর্থাৎ ঈসা ইবনে মারিয়ম ব্যতীত কোন মাহদী নাই। *(সুনানে ইবনে মাজাহ কিতাবুল ফিতন)*

তাই মুহাম্মদ (সা.)-এর বক্তব্য অনুযায়ী ঈসা (আ.)-এর অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত যে সকল বর্ণনা রয়েছে সেগুলো এ ভাবেই বুঝতে হবে যে, আগমনকারী ঈসা (আ.) মাহ্‌দী ব্যতীত আর কেউ নন। এখন আসা যাক প্রবন্ধের মূল বিষয়ের দিকে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্নাবীঈন, তাঁর মাধ্যমে শরীয়ত ও ধর্ম পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর পরে আর কোন নতুন শরীয়ত বা নতুন ধর্ম আসবে না। কেননা তিনি (সা.) শেষ নবী। তবে মুহাম্মদী শরীয়তের অধীনে আল্লাহ্ এবং তার রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আনুগত্যে 'আনুগত্যকারী নবুয়্যত' লাভ মোটেও অসম্ভব নয়। এমনটিই আল্লাহ্‌পাক, মহানবী (সা.) ও উম্মতের সর্বজনমান্য বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন। সূরা নিসার ৭০ (সত্তর) নম্বর আয়াতেও আল্লাহ্ তা'লা এমনটিই এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

অর্থাৎ এবং যারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের [মহানবী (সা.)] আনুগত্য করবে তারা ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেছেন এবং এরা সাথি হিসাবে বড়ই উত্তম।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে উপরোল্লিখিত চারটি পুরস্কার অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ এর যে কোন একটি পুরস্কার এ জগতে লাভ হলে অবশ্যই অপর তিনটিও লাভ হবে। কেননা এখানে চারটি পুরস্কারের একটিকে অপরটির সাথে 'ওয়াও-এ-আতেফা' অর্থাৎ সংযোজক অব্যয় সূচক অক্ষর দিয়ে পরস্পর যুক্ত করা হয়েছে। এটি সর্বজনবিদিত বিষয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে অনেকেই সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ এর পুরস্কার লাভ করেছেন। তাই নবুয়্যতের যোগ্যতা থাকলে এবং যুগের চাহিদা থাকলে অবশ্যই সে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করে এ জগতেই এই উম্মতের মধ্য থেকে উম্মতী অর্থাৎ অধীনস্থ নবীর পদমর্যাদা লাভ করতে পারে। এমনটিই উপরোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এরশাদ করেছেন। কেননা আল্লাহ্ ত'লা তাঁর পাক কালামে 'ওয়াও-এ-আতেফা' দিয়ে চারটি পুরস্কারকে পরস্পর জুড়ে দিয়েছেন। একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোন সুযোগ নেই। আরবী ভাষার ব্যাকরণও এটিকে সমর্থন করে। এ কারণেই উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা (রা.) হযরত মোহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে বলেছেন-

قُوْلُوْا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমরা মহানবী (সা.)-কে খা'তামান্নাবীঈন বল কিন্তু এ কথা বলো না যে, তাঁর পরে কোন নবী নাই। *(দুররে মান্‌সুর, ৫ম খন্ড)*

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আগমনকারী ঈসা বা মাহদীর উম্মতী নবী হওয়া স্পষ্ট ভাবে প্রমানিত।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে 'উম্মতী নবী'–এর পদমর্যাদা দান করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, **"আমি যদি মহানবী (সা.) এর উম্মত না হতাম আর তাঁর (সা.)-এর অনুসরণ না করতাম তাহলে আমার আমল জগতের সমস্ত পাহাড়সমান হলেও আমি কখনো কথোপকথন বা ঐশী বাক্যালাপের মর্যাদা লাভ করতাম না। কেননা এখন মুহাম্মদী নবুয়্যত ব্যতিরেকে সকল প্রকার নবুয়্যতের পথ বন্ধ।** শরীয়তধারী কোন নবী আসতে পারে না। তবে শরীয়তবিহীন নবী আসতে পারে। তবে শর্ত হলো তার জন্য প্রথমে উম্মতী হতে হবে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমি উম্মতীও আর নবীও। আর আমার নবুয়্যত এবং বাক্যালাপ হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের একটি প্রতিচ্ছায়া। এছাড়া আমার নবুয়্যত অন্য কিছুই নয়।" *(রুহানী খাযায়েন, খন্ড:২০, পৃষ্ঠা: ৪১১)*

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরান–এর ৮২ নম্বর আয়াতে প্রত্যেক নবী থেকে তাদের পরে আগমনকারী নবীকে মান্য করা এবং সত্যায়নের অঙ্গীকার নেয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ

"আর (স্মরণ কর) আল্লাহ্ যখন আহলে কিতাবের কাছ থেকে সব নবীর মাধ্যমে এই বলে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমি কিতাব ও প্রজ্ঞার যাই তোমাদেরকে দেই এরপর তোমাদের কাছে যা রয়েছে এর সত্যায়নকারী রূপে কোন রসূল তোমাদের কাছে এলে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে। এবং অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ বিষয়ে আমার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে? তারা বললো আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।"

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত নূহ (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.) প্রমুখ নবী থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, পরবর্তী সত্যায়নকারী নবী আসলে তাকে মানতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)–এর নিকট থেকেও তাঁর পরে আগমনকারী সত্যায়নকারী নবী আসার উল্লেখ সূরা আহযাবের ৮ নম্বর আয়াতে মিনকা' (তোমার নিকট থেকেও) শব্দে উল্লেখ করেছেন। যেমন কিনা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

অর্থাৎ, স্মরণ কর আমরা যখন নবীদের কাছ থেকে তাদের অঙ্গিকার নিয়েছিলাম এবং তোমার কাছ থেকেও এবং নূহ, ইব্রাহিম, মূসা ও মরিয়মের পুত্র ঈসার কাছ থেকেও (অঙ্গিকার নিয়েছিলাম) আর আমরা এদের সবার কাছ থেকে এক সুদৃঢ় অঙ্গিকার নিয়েছিলাম *(সূরা আহযাব, আয়াত: ৮)*।

হযরত নুহ (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল সে অঙ্গীকার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর কাছ থেকেও নেয়া হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, সে অঙ্গীকারটি কি ছিল? এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা সূরা আলে ইমরানের ৮২ নম্বর আয়াতে বলে দিয়েছেন যে, সে অঙ্গিকার ছিল তাঁদের পরবর্তীতে সত্যায়নকারী নবী আসলে তাঁকে মানতে হবে। তাই মহানবী (সা.)-এর পরে আগমনকারী সত্যায়নকারীকে মানার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন। আর এ-কারণেই মহানবী (সা.)-ও শেষ যুগে এ উম্মতে আগমনকারী ঈসা কে চার বার **'নবী উল্লাহ'** শব্দে সম্বোধন করেছেন।

"মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ফিতান, বাব যিকরুদ্দাজ্জাল"-এ মহানবী (সা.) আগমনকারী ঈসাকে চার বার **'নবীউল্লাহ'** অর্থাৎ 'আল্লাহ্র নবী' বলে সম্বোধন করেছেন।

এই হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, যখন হযরত মসীহ্ ও মাহ্দী ইয়া'জুজ মা'জুজ-এর প্রাধান্যের যুগে আগমন করবে, তখন মসীহ্ নবীউল্লাহ এবং তাঁর সাহাবাগণ শত্রুদের কব্জায় বন্দী হয়ে যাবেন। অত:পর মসীহ নবীউল্লাহ এবং তাঁর সাহাবাগণ আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা এবং বিগলনের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করবেন। সেই দোয়ার ফলশ্রুতিতে মসীহ্ নবীউল্লাহ এবং তাঁর সাহাবাগণ সমস্যার কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়ে শত্রুদের আস্তানায় ঢুকে যাবেন। কিন্তু সেখানে নতুন সমস্যাবলীর সম্মুখিন হবেন। অতপর **'মসীহ নবীউল্লাহ'** এবং তাঁর সাহাবাগণ পুনরায় খোদা তা'লার সমীপে দোয়ার মাধ্যমে অবনত হবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অসুবিধাসমূহ দূর করে দিবেন। এই হাদীসে মহানবী (সা.) আমাদেরকে সম্বোধন এবং সতর্ক করে বলেছেন, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী যখন দাজ্জাল এবং ইয়াজুজ মা'জুজ-এর ফিতনা দমন করে মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম রক্ষাকল্পে অগ্রসর হবেন তখন তোমরা তাঁর সাহায্যকারী হবে। তিনি কোন সাধারণ ব্যক্তি হবেন না বরং আল্লাহ্ তা'লার নবী হবেন । তাই তাঁর অস্বীকার আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারন হবে। এ কারণে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবে।

মহানবী (সা.) যে মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনিই হচ্ছেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানী (আ.)। তিনি ১৩০০ হিজরীর মধ্যভাগে ১৪ শাওয়াল ১২৫০ হিজরী মোতাবেক ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্তানের পাঞ্জাব

প্রদশের কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব এবং যৌবন অতিবাহিত করার পর প্রায় ৪৭ বছর বয়সে ১৩০০ হিজরীর শেষ দিকে ১২৯৯ হিজরী অর্থাৎ মার্চ ১৮৮২ তে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ইলহামের মাধ্যমে সম্মধোন করে বলেন:

"হে আহমদ! আল্লাহ্ তা'লা তোমাতে বরকত রেখেছেন। প্রত্যেক বরকত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) থেকে উৎসারিত। সুতরাং অত্যন্ত কল্যানমণ্ডিত তিনি, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তুমি বলে দাও আমি যদি মিথ্যা রটনা করে থাকি তাহলে আমার পাপ আমার উপর বর্তাবে। আল্লাহ্ সেই সত্তা যিনি তাঁর প্রেরিতকে নিজের হেদায়েত এবং সত্যধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন। যেন এই ধর্মকে সমস্ত ধর্মের উপর বিজয় দান করেন।" *(তাযকেরাহ, পৃষ্ঠা:৩৫)*

সুরা সাফে বর্ণিত :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

অনুবাদঃ তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সব ধর্মের ওপর বিজয় দান করেন। আর মুশরিকরা যত অপছন্দই করুক না কেন।
(সুরা আস্ সাফ্ফ: ১০)

এই আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম সত্যায়নকারী হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আর উপরোল্লিখিত ইলহামে তাঁর (সা.)-এর আনুগত্য ও দাসত্বে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে উম্মতী নবী অর্থাৎ অধিনস্থ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর রচিত পুস্তকসমূহে এই ঘোষণা বারবার উল্লেখ করেছেন যে, আমি সেই খোদার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন আর তিনি আমাকে মসীহ মওউদ নামে সম্বোধন করেছেন। এছাড়া তিনি আমার সত্যায়নের জন্য বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেছেন যা তিন লক্ষে পৌঁছেছে। *(পরিশিষ্ট হাকিকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন, খন্ড: ২২, পৃষ্টা: ৫০৩)*

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সুরা সাফের ১০ নম্বর আয়াতে যে মহাপুরুষের আগমনের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার কথা উল্লেখ করেছেন, তফ্সীরকারকদের প্রায় সকলেই এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এ আয়াতটি প্রতিশ্রুত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে। এ আয়াতটি কুরআন করীমের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী। এ ব্যাপারে গবেষক, আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে এটি পূর্ণ হবে। *(তিরইয়াকুল কুলুব, রুহানী খাযায়েন, খন্ড: ১৫,পৃষ্ঠা: ২৩২)*

এই আয়াতের ব্যখ্যায় ইবনে জারীরে লেখা আছে,

هَذَا عِنْدَ خُرُوْجُ الْمَهْدِى

অর্থাৎ সারা বিশ্বে ইসলামের এই বিজয় ইমাম মাহ্দীর যুগে সাধিত হবে।

শিয়াদের প্রসিদ্ধ কিতাব 'বিহারুল আন্ওয়ারেও' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِ مِنْ اٰلِ مُحَمَّدٍ অর্থাৎ এ আয়াত মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধর আল কায়েম (ইমাম মাহ্দী) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এছাড়া শিয়াদের আরো একটি বিশ্বস্ত কিতাব 'গায়াতুল মাকসুদ' ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৩ -এ লেখা আছে,

مراد از رسول دریں جا امام مہدی است

অর্থাৎ এ স্থানে প্রতিশ্রুত রসুল বলতে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীকেই বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং শিয়া-সুন্নি উভয়ই এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী যে, ইসলামের বিশ্বব্যাপি বিজয় প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দীর যুগেই সাধিত হবে।

ভবিষ্যতে মুসলমানরা যে অবস্থা ব্যবস্থা এবং সময় অতিবাহিত করবে, সে প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা ছিল, **"হে মুসলমানগণ! তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। তারপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তা ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর যুলুম, অত্যাচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তা ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর সেটি অহংকার ও জবরদস্তি মুলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে। আর সেটি ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতপর আল্লাহ্ তা'লা সেটি উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।"** *(মুসনাদ্ আহমদ ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৭৩)*

দিল্লী থেকে 'আসাহ্হুল মাতা'বে' -এর মালিক নূর মুহাম্মদ সাহেব যে 'মিশকাতুল মাসাবিহ' ছেপেছিলেন, তাতে এ হাদীসের নিচে লেখা ছিল:

'আয্যাহেরু আন্নাল মুরাদা লাহু যামানা ঈসা ওয়াল্ মাহ্দী'
অর্থাৎ স্পষ্ট যে, এর অর্থ হচ্ছে ঈসা ও মাহ্দী (আ.)-এর যুগ।

মহানবী (সা.) নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত জারীর যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার অর্থ আমরা তাঁর (সা.) থেকেই জানতে পারি যে, مَا مِنْ نُبُوَّةٍ قَطُّ إِلَّا تَبِعَتْهَا خِلَافَةٌ অর্থাৎ প্রত্যেক নবুয়্যতের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে *(কান্‌যুল উম্মল, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৯)*

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) উম্মতী (অধীনস্থ) নবী হবেন। আর তাঁর পরে দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীর ইন্তেকালের পর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফতের ধারা ২৭মে ১৯০৮ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে জারী হয়েছে। আর ইনশাআল্লাহ্ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

আবু দাউদ শরীফের কিতাবুল মালাহেম, বাব খুরুজুদ্ দাজ্জাল -এ মহানবী (সা.) আগমনকারী ঈসা অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আ.) কে নবী আখ্যা দিয়েছেন। যেমন কিনা মহানবী সা বলেছেন:-

لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ

অর্থাৎ আমার এবং ঈসা (আ.) -এর মধ্যবর্তী কোন নবী হবে না। আর নিশ্চিত ঈসা (আ.) নাযেল হবেন। অতএব যখন তোমরা তাঁকে দেখবে বা তাঁর সাক্ষাত পাবে তখন তাঁকে (তাঁর নিদর্শনসমুহের মাধ্যমে) চিনবে।

এই হাদীসে মহানবী (সা.) নির্দিষ্ট করে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে দিয়েছেন,

১. যেভাবে আমি খোদা তা'লার নবী তদ্রুপ আগমনকারী মসীহ্ মাহদীও আল্লাহ্ তা'লার নবী হবে। যদিও আগমনকারী মসীহ ও মাহদী আমার সেবক, শিষ্য এবং প্রতিচ্ছায়া হবে তথাপি তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

২. উম্মতে মুহাম্মদীয়ার একপ্রান্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি আর অন্য প্রান্তে উম্মতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী।

৩. এ হাদীসে মহানবী (সা.) মুসলমানদের পথ প্রদর্শনার্থে নির্দেশ দিয়েছেন, যদি ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আমার উম্মতে কোন ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবী করে তাহলে তোমরা তাকে অবশ্যই গ্রহণ করবে না। কেননা সে ৩০ দাজ্জালের মধ্য থেকে কোন একজন হবে।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "বস্তুত ব্যাপক ঐশীবাণী এবং অদৃশ্য বিষয়াবলি লাভের ক্ষেত্রে এ উম্মতে আমিই একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব। আমার পূর্বে যত ওলী-আউলিয়া, গওস-কুতুব, পীর এ উম্মতে অতিবাহিত হয়েছেন তাদেরকে এই নেয়ামত থেকে ব্যাপক অংশ দেয়া হয়নি। সুতরাং এ কারণেই নবী নামে আখ্যায়িত হওয়ার জন্য আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আর অন্য কেউই এই নামের যোগ্য নয়। কেননা নবী নামের জন্য শর্ত হচ্ছে ব্যাপক ওহী এবং অদৃশ্যের বিষয়াবলি লাভ করা। আর এই শর্ত তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।" *(হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন ২২ খন্ড ৪০৬ পৃষ্ঠা)*

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.) সংক্রান্ত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অত্যন্ত জোরালোভাবে তাঁর উম্মতের সদস্যদের আগমনকারী মাহ্দীর হাতে বয়াত করতে এবং তাঁর পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম পৌঁছাতে নির্দেশ দিয়েছেন। উপরন্তু তাঁর এ জোরালো নির্দেশের কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিশ্রুত মাহ্দী আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মনোনিত খলীফা হবেন। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) সুনানে ইবনে মাজাহ্, কিতাবুল ফিতন্ বাব খুরুজুল মাহদী ২য় খণ্ডতে বলেছেন :

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ
فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ

অর্থাৎ যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে তখন তোমরা তাঁর হাতে বয়াত করবে যদি বরফের পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়। কেননা নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্ তা'লার খলীফা আল-মাহদী।

লক্ষ্য করুন! মহানবী (সা.) কত জোরালোভাবে আগমনকারী মাহদীকে আল্লাহ্র খলীফা আখ্যা দিয়েছেন। আর জোরালো তাগিদ দিয়েছেন যে, মুসলমানরা যেন সবধরনের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তার হাতে বয়াত করে। মহানবী (সা.) এই হাদীসে যে জোরালো নির্দেশ প্রদান করেছেন নিশ্চয় কাউকে মানা ও গ্রহণ করার ব্যাপারে এর চেয়ে জোরালো নির্দেশ সম্ভব নয়। তথাপি এক শ্রেণীর নামসর্বস্ব আলেম ইমাম মাহ্দীকে মানার এবং তাঁর হাতে বয়াত করার ব্যাপারে আপত্তি আকারে প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন।

অপর এক হাদীসে মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন:

فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ

অর্থ্যাৎ (তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাঁকে পাবে) তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান উম্মতকে তৌফিক দান করুন, তারা যেন যুগ ইমামকে গ্রহণ করে দু:খ কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। একে অপরের প্রতি যে যুলুম করছে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সেই যুলুম করা থেকে বিরত রাখুন। ইসলাম নিজের প্রকৃত মর্যাদার সাথে প্রত্যেক ইসলামী দেশে প্রকাশিত হোক । (আমিন)

‘একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ’ ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন

মাওলানা মাসুম আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে আকাশের বুকে অসংখ্যবার চন্দ্রগহণ ও সূর্যগ্রহণ লেগেছে এ কথা সর্বজনজ্ঞাত। আমরা খুব ছোটবেলাতেই বিজ্ঞানের পাঠ্যপূস্তকে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ কী এবং কিভাবে তা ঘটে সে সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। পৃথিবী যেমন সূর্যের চারপাশে অনবরত ঘুরে চলেছে ঠিক তেমনি চাঁদও পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। পরস্পরের এই আবর্তন বা প্রদক্ষীণের সময় যখনই সবাই একই সরল রেখায় অবস্থান করে তখনই ঘটে থাকে এই গ্রহণ। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবী থাকে সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্তী অবস্থানে এবং সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্র থাকে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী অবস্থানে। প্রশ্ন উঠতে পারে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ নিয়ে কেন এত আলোচনা এবং এর গুরুত্বই বা কি? হ্যাঁ সুধী পাঠক! সাধারণ অর্থে এর তেমন কোন গুরুত্ব নাইবা থাকতে পারে কিন্তু যখনই এটি কোন মহাপুরুষের আগমণের একটি নিদর্শন হিসেবে নির্ধারিত হবে তখনি এর গুরুত্ব বেড়ে যাবে শতগুণ। এটি কোন সাধারণ ব্যক্তির আগমনের নিদর্শন নয় এমন একজন মহাপুরুষের আগমনের নিদর্শন যার কথা স্বয়ং আমাদের প্রাণপ্রিয় রসূল নবীকূল শিরোমণি রসূলে আকরাম (সা.) বলে গেছেন এবং শুধু বলেই ক্ষান্ত হননি বরং এই আদেশ প্রদান করেছেন যে, যখনই তোমরা আমার মাহ্দীর আগমনের সংবাদ পাবে তখনই তাঁর নিকট গিয়ে বয়াত করবে এবং আমার সালাম পৌঁছাবে কেননা তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা ‘আল-মাহ্দী’।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন সম্বন্ধীয় অনেক নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী কোরআন ও হাদীস শরীফে বিদ্যমান আছে। সেই নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম নিদর্শন হলো একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ। এটি এমন এক নিদর্শন যার উপর হস্তক্ষেপ করা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। রসূলে করীম (সা.) তাঁর মাহদীর এই নিদর্শন সম্পর্কে বলেন,

إِنَّ لِمَهْدِيِّنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ

অর্থঃ নিশ্চয় ‘আমার মাহ্দীর জন্য এমন দু’টি নিদর্শন আছে যা আকাশ-যমিন সৃষ্টি অবধি আর কখনও কারো জন্য প্রদর্শিত হয়নি। তা হল, একই রমযান মাসে প্রথম রাতে হবে চন্দ্রগ্রহণ এবং মধ্যম তারিখে হবে সূর্যগ্রহণ।’ *(সুনান দারকুতনী)*

শুধু হাদীস শরীফেই নয় বরং কোরআন শরীফ ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থেও এক বিশেষ প্রতিশ্রুত গ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে: হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ পাঠ করলে দেখা যায় যে, কলি কালে একটি বিশেষ সময়ে “সূর্য্য, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি এক রাশিতে পক্ষ নক্ষত্রে একত্রিত হবে” (ভাবগত পূরাণ, ১৩ স্কন্দ)। মহাভারতে আছে, “সূর্যং রাহু রুপষ্যতি। যুগান্তে হুতভূক চাপি সর্বতঃ প্রজ্বলিষ্যতি” (বনপর্ব, ১৯০/৮২)। অর্থাৎ যুগান্তে বা শেষ যুগে যখন সমগ্র পৃথিবীতে আগুন জ্বলে উঠবে (আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে), তখন অতিথিতে এক বিশেষ রাহুগ্রাস বা গ্রহণ সংঘটিত হবে।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী: প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমনকালে, “সূর্য অন্ধকার হবে ও চন্দ্র জ্যোৎস্না দেবে না” *(মথি ২৪ঃ২৯)* “সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চন্দ্র রক্তবর্ণ ধারণ করবে।” *(প্রেরিত ২ঃ২০)*

শিখ ধর্মগ্রন্থে: শিখদের গ্রন্থেও আছে যে, যখন মাহদী মীর আবির্ভূত হবেন তখন চন্দ্র সূর্যেও তাঁর লক্ষণ প্রকাশিত হবে। যেমন বলা হয়েছে- “নিহ কলঙ্ক বাজে ডঙ্ক, চড়হোদিল রবি ইন্দ্রজিও। *(গ্রন্থ সাহেব, মুহল্লা ৭, ঝুলনা ৪)*

পূর্ণ শরীয়ত আল কোরআনে:

وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

অর্থ: চন্দ্র গ্রহণ হবে, সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহণ হবে। সেই সময় লোকেরা বলবে আর পলায়ন করার জায়গা কই? (অর্থাৎ দলীল প্রমাণ দ্বারা অস্বীকার করার আর কোন পথ থাকবে না)। *(সুরা আল-ক্বিয়ামা ৯-১১)*

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও অনেক জ্ঞানীগুণী, আলেম ও ওলীদের লিখিত গ্রন্থেও শেষ যামানায় একটি বিশেষ গ্রহণের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন: (১) ফতোয়া হাদীসীয়া- হাফেয ইবনে হাজর মক্কী (২) হুজাজুল কেরামা (৩) বিহারুল আনওয়ার (৪) কাসিদা নিয়ামত উল্লাহ্ ওলী ইত্যাদি।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটিই প্রতীয়মাণ হয় যে, নবী করীম (সা.) যেই মাহদীর আগমনের শুভ সংবাদ দিয়ে গেছেন, তাঁর যুগে অবশ্যই সেই প্রতিশ্রুত গ্রহণ দু'টি সংঘটিত হবে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মাহ্দী হওয়ার দাবী তো অনেকেই করতে পারে তবে তাদের মধ্যে যার দাবীর পর এই গ্রহণ দুটি সংঘটিত হবে তিনিই হবেন মহানবী (সা.)-এর সেই প্রতিশ্রুত মাহ্দী (আ.) যেই মাহ্দীকে মহানবী (সা.) তাঁর সালাম জানিয়ে গেছেন।

সুধী পাঠক! আমরা যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ বা ইতিহাস দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই এ প্রতিশ্রুত গ্রহণ কেবলমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী দাবীর ঠিক দুই বৎসর পরেই অনুষ্ঠিত হয়। হাদীস শরীফে এই গ্রহণের যে লক্ষণ ও বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবেই এই গ্রহণ দু'টি সংঘটিত হয়েছে এতে সামান্য পরিমাণও ব্যতিক্রম ঘটে নি।

ভারতের উসমানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নভোবিজ্ঞানী অধ্যাপক সালেহ্ মোহাম্মদ আলাদীন সাহেব তার সহকর্মী ড. মোহন বল্লভ গোস্বামীকে নিয়ে একযোগে এ ব্যাপারে গবেষণা করেছেন। তারা ১৮০০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত রমযানে অনুষ্ঠিত গ্রহণ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এই গবেষণায় তারা দেখেছেন যে, এই দুই শতাব্দীতে এ পর্যন্ত সতেরো (১৭) বার সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ রমযানে হয়েছে। এগুলোর মধ্যে শুধু ১৮৯৪ সালের গ্রহণদ্বয়ই নির্ধারিত তারিখে ঘটেছে এবং কাদিয়ান থেকে স্পষ্ট দেখা গেছে। সরকার পরিচালিত কলিকাতাস্থ Meteorological Department positional Astronomy Centre কর্তৃক পরিচালিত গবেষণাটিতে দেখা গেছে যে, দশবার সংঘটিত এহেন গ্রহণের মধ্যে ১৮৯৪ সালের গ্রহণই শুধু কাদিয়ান থেকে দেখা যায়।

এই গ্রহণের বিশেষত্ব হল: (১) একই রমযান মাসে হওয়া (২) চন্দ্রগ্রহণের তারিখ সমূহের মধ্যে ১৩ তারিখে ও সূর্যগ্রহণের তারিখসমূহের মধ্যে ২৮ তারিখে গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়া (৩) মাহ্দী হওয়ার দাবীকারক বিদ্যমান থাকা (৫) ইমাম মাহ্দী (আ.) স্বয়ং এই গ্রহণকে তাঁর সত্যতার নিদর্শনরূপে দাবী করা।

প্রতিশ্রুত মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৫ সালে। ১৮৮২ সালে তিনি মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) হওয়ার দাবী করেন। ১৮৯১ সালে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হওয়ার দাবী করেন। তিনি (আ.) তাঁর সত্যতা প্রমাণে অনেক দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যুগের অবস্থাই তাঁর দাবীর সত্যতা প্রমাণে যথেষ্ট ছিল। তারপরেও তিনি তাঁর সত্যতা প্রমাণে ইশতেহার, বিজ্ঞাপন, পত্রাবলি ও পুস্তকের সাহায্যে কুরআন, হাদীস ও বুযুর্গানেদ্বীন প্রণীত পুস্তকের আলোকে নিজের দাবীর সত্যতার দলীল দেন। তাঁর সত্যতার প্রমাণে কুরআন ও হাদীসের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে কিন্তু এতসব ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্টভাবে পূর্ণ হওয়ার পর ও দীলল-প্রমাণ উপস্থাপন করা সত্ত্বেও মোল্লা-মৌলবীরা হৈ চৈ করে বলতে লাগলেন যে, 'আমরা এত সহজে মানব না'। যদি এই দাবীকারকের সমর্থনে একই রমযান মাসে আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ লাগে তবেই আমরা মানতে পারি'। হযরত মির্যা সাহেব তখন তাদের এই দাবীর প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করলেন "হে খোদা, আমি কি তোমার পক্ষ থেকে নই ? ...'ফাফ্তাহ্ বাইনানা ওয়া বাইনা কাউমিনা বিল হাক্কে ওয়া আন্তা খায়রুল ফাতেহীন' অর্থাৎ আমার ও আমার জাতির মধ্যে তুমি সত্য সহকারে ফয়সালা কর কেননা তুমিই উৎকৃষ্ট মীমাংসাকারী। *(নূরুল হক, ১ম খন্ড)*

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই দোয়া কবুল করেন। তিনি যদি সত্য মাহ্দী নাই হতেন তাহলে তাঁর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লার এই ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন কি আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদার পরিপন্থী ছিল না? যেখানে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে স্পষ্ট করে ঘোষণা দিয়েছেন যে, কেউ যদি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আসার মিথ্যা দাবী করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে ধ্বংস করে দিবেন। (সুরা আল- হাক্কা: ৪৫-৪৮)। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৯১ সালে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হওয়ার দাবী করেন। ১৮৯৪ সালে অর্থাৎ ১৩১১ হিজরী সনের রমযান মাসের ১৩ তারিখ সন্ধ্যা ৭ টা থেকে রাত ৯-৩০ মিনিট পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮ তারিখ সকাল ৯টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত সংঘটিত হয় সূর্যগ্রহণ। রমযানের ১৩ ও ২৮ তারিখ ছিল যথাক্রমে ২১ মার্চ ও ৬ এপ্রিল। এই গ্রহণের সংবাদ তৎকালীন আজাদ, পাইওনিয়ার এবং মিলিটারী গেজেট পত্রিকায় ছাপা হয়।

এই গ্রহণ দু'টি সংঘটিত হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি, যার

হাতে আমার প্রাণ, তিনি আমার সত্যতার জন্য আকাশে নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। .....আমি খানা কা'বায় দাঁড়িয়ে কসম খেয়ে বলতে পারি যে, এই নিশান আমার সত্যতার জন্য"। *(হাকীকাতুল ওহী, পৃঃ ৪৫)*

এই গ্রহণের পর মৌলবী সাহেবরা হতভম্ভ হয়ে গেলেন। তাদের চেহারা মলিন হয়ে গেল। এরপরও তারা এই জাজ্বল্যমান সত্যকে মানতে রাজী হলেন না। তারা এখন একটি নতুন বাহানা বানাল। তারা বলতে লাগলো 'চন্দ্রগ্রহণ' হবে রমযানের প্রথম তারিখে কিন্তু এই গ্রহণ হয়েছে রমযানের ১৩ তারিখে। অতএব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। 'আমরা মির্যা সাহেবকে মানি না, মানব না।' মসীহে মওউদ (আ.) এর উত্তরে বলেন যে, 'প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার অর্থ প্রাকৃতিক নিয়মে চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্ধারিত রাতগুলির প্রথম রাত অর্থাৎ ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হওয়া।' *(নূরুল হক, ২য় খন্ড)*

এখানে উল্লেখ্য যে, এই হাদীসে চন্দ্রের জন্য 'কমর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এক থেকে তৃতীয় দিনের চাঁদকে আরবীতে 'হেলাল' বলে। চার থেকে মাসের শেষ দিন পর্যন্ত পূর্ণিমা ছাড়া সকল দিনকে বলা হয় কমর। আর আরবীতে পূর্ণিমাকে বলা হয় 'বদর'। (আকরাবুল মুয়ারেদ)। অতএব হাদীসে যেহেতু 'কমর' শব্দ এসেছে সেহেতু এই গ্রহণ কখনও প্রথম দিনের অর্থাৎ দ্বিতীয়ার চাঁদে হতে পারে না। প্রথম দিনের চাঁদ তো অনেক সময় দেখাই যায় না। ঈদ ও রমযানের চাঁদ দেখা নিয়ে কতই না মতভেদ দেখা যায় জনগনের মাঝে। সরু-বক্র-ক্ষীণ চাঁদে কি গ্রহণ দর্শন সম্ভব? কখনোই না। প্রথম তারিখের হেলাল বা নয়া চাঁদে গ্রহণ লাগলে (যদিও তা সম্ভব নয়) তা মানুষের চোখে পড়ার আগেই ডুবে যাবে এবং এ কারণেই তা পৃথিবীর মানুষের জন্য আসমানী নিদর্শন হতে পারে না।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সত্য মাহ্দীর জন্য এই ঐশী নিদর্শন এমনভাবে প্রদর্শন করলেন যে, বিরোধীদের মুখে তালা লেগে গেল। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এ নিদর্শন প্রদর্শিত হওয়ার সময় অনেক মোল্লা-মৌলবী বাড়ীর ছাদে উঠে যখন এই নিদর্শন দেখেছিল তখন চিৎকার করে এ কথা বলতে থাকে, হে আল্লাহ্! তুমি একি করলে? এখন তো মির্যা সত্য প্রমাণিত হয়ে যাবে। বিরোধীদের এটাই সুন্নত যে, তারা যতই নিদর্শন দেখুক তারা তাদের বিরোধীতায় অটল থাকে। এই নিদর্শন প্রদর্শনের পর শুধুই যে বিরোধীতা হয়েছে তা নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার অনেক সাধু প্রকৃতির বান্দা তাঁর সত্য মাহ্দীকে মান্য করার তৌফিক লাভ করেছে (আলহামদুলিল্লাহ্)।

১৮৯৪ সালে এই প্রতিশ্রুত গ্রহণ দু'টি পূর্ণ মর্যাদার সাথে প্রকাশিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই সত্য মাহ্দীর সত্যতা আরো স্পষ্ট করে পৃথিবীবাসির সম্মুখে উন্মোচন করার জন্য মাত্র এক বছরের ব্যবধানে আরেকবার এই নিদর্শন প্রদর্শন করেন ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে। এই গ্রহণ দু'টির মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয় ১১ মার্চ এবং সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয় ২৬ মার্চ। তারিখ দুটি ছিল যথাক্রমে ১৩১২ হিজরী সনের রমযানের ১৩ তারিখ ও ২৮ তারিখ।

এই চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ কোন সাধারণ ঘটনা নয়। এই নিদর্শন মানবীয় শক্তির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের এই নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক সেভাবেই যেভাবে রসূলে আকরাম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তেরশত বৎসর পরে জ্যোতিষ্কমন্ডলীতে সংঘটিত এই ঘটনা প্রমাণ করেছে যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আল্লাহ্ তা'লার সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী যাকে রসূলুল্লাহ (সা.) 'আমার মাহ্দী' বলে সম্বোধন করেছেন এবং যাকে তাঁর সালাম পৌঁছাতে বলেছেন।

অতএব আজ আমরা যারা এসব ঐশী নিদর্শনের সত্যতা প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে সত্য মাহ্দীর জামাতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আমাদের দায়িত্ব আমরা যেন প্রকৃত অর্থেই তাঁর বয়াতের শর্তসমূহ পালনকারী হতে পারি এবং সত্য মাহ্দীর এই সংবাদ নিজ সাধ্যমত অন্যদের মধ্যে যারা এখনও তাঁর আগমনের সংবাদ পায় নি বা তাঁর জামাতে অন্তর্ভূক্ত হয় নি তাদের কাছে প্রচার করতে সচেষ্ট হই, মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন। আর এখনো যারা এই প্রতিশ্রুত সত্য মাহ্দীকে মান্য করেন নি তাদের কাছে নিবেদন, আপনারা রসূলুল্লাহ্র (সা.) সেই ভবিষ্যদ্বানীর সত্যায়নে প্রদর্শিত ঐশী নিদর্শনের সত্যতা বিচার বিশ্লেষণ করে যামানার ইমাম সত্য মাহ্দীর হাতে বয়াত গ্রহন করুন এবং তাঁর কাছে নবী করীম (সা.)-এর সালাম পৌঁছে দিয়ে নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব পালন করুন ও প্রকৃত ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিন। আল্লাহু নি'মাল মওলা ও নি'মান্ নাসীর।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীদের দৃষ্টান্তমূলক পরিণাম

মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যখনই পৃথিবীর সংশোধনকল্পে কোন নবী-রসূল ও মা'মূর প্রত্যাদিষ্ট হন, তখন ধর্ম ও সত্যের বিরোধীদের পক্ষ থেকে মিথ্যাচার, প্রতারণা, অসাধুতা প্রভৃতি শয়তানি অস্ত্রের মাধ্যমে আক্রমণ করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا

"আর আমরা রসূলদেরকে শুধুমাত্র সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়ে থাকি এবং যারা কুফরী (অস্বীকার) করেছে তারা মিথ্যার সাহায্যে তর্কবিতর্ক করে, যেন এর মাধ্যমে তারা সত্যকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আমার নিদর্শনাবলীকে এবং যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল সেটিকে তারা উপহাসের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে।" *(সূরা কাহ্ফ ঃ ৫৭)*

আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন ঃ

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

"পরিতাপ! বান্দাদের জন্য, তাদের কাছে এমন কোন রসূল আসে নি, যার প্রতি তারা উপহাস না করেছে।" *(সূরা ইয়াসীন ঃ ৩১)*

কুরআন করীম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহ্দী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। অমনি তাঁর (আ.) বিরোধিদের পক্ষ থেকে বিরোধীতার ঝড় বইতে শুরু করল। আর এই কাজ বিগত প্রায় একশত ত্রিশ বছর ধরে চলমান। কিন্তু এই সত্য ও ন্যায়ের বিরোধী ও শত্রু পক্ষের শত অপচেষ্টা এবং ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক জামা'ত উত্তরোত্তর অভাবনীয় উন্নতি সাধন করে চলেছে, আর বিরোধীদেরকে ঐশী কোপানল ও লাঞ্ছনা গঞ্জনার মুখ দেখতে হচ্ছে। 'জামাতী ইসলামী' দলের একটি পত্রিকা 'আল মুনীর' ১৯৫৬ সনের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের সংখ্যাতে এ কথা অকপটে স্বীকার করে:

"আমাদের কতক সম্মানিত, মান্যগণ্য, বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ নিজেদের তাবৎ শক্তি সামর্থ্য দিয়ে কাদিয়ানীয়্যাতের মোকাবিলা করেছে কিন্তু এই সত্য সকলের সম্মুখে প্রতীয়মান যে, কাদিয়ানী জামাত পূর্বের তুলনায় আরো দৃঢ়তা লাভ করেছে। মির্যা সাহেবের মোকাবিলায় যারা দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝে অধিকাংশই তাকওয়া, তা'আল্লুক বিল্লাহ্ (আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন), নিষ্ঠা, জ্ঞান এবং প্রভাব প্রতিপত্তির বিবেচনায় পাহাড় সমান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। সৈয়্যদ নাযির হুসেন দেহলভী, মওলানা আনোয়ার শাহ্ দেওবন্দী, মওলানা ক্বাযী সুলায়মান মানসুরপুরী, মওলানা মুহাম্মদ হুসেন বাটালভি, মওলানা আব্দুল জাব্বার গজ্নভী, মওলানা সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী এবং আরো অন্যান্য প্রসিদ্ধ আলেমদের (রাহিমাল্লাহু ওয়া গাফারা লাহুম) ব্যাপারে আমাদের সুধারণা হলো এই যে, এই বুযুর্গ আলেমরা কাদিয়ানীয়্যাতের বিরোধিতায় অত্যন্ত তৎপর ছিলেন আর তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি এতটাই বেশি ছিল যে, মুসলমান সমাজে তাদের সমতুল্য খুব কম লোকই ছিল। যদিও এই কথাগুলো শুনতে এবং পাঠকের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক হবে তবুও আমরা এই তিক্ত সত্য প্রকাশে নিরুপায় যে, এই সমস্ত প্রসিদ্ধ বড় বড় আলেমদের তাবৎ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কাদিয়ানী জামাতের ক্রমাগত উন্নতি হয়েছে।" (আল মুনীর, লায়লপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ ইং)

হযরত আকদাস্ মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামাতের বিরোধীদের ব্যর্থতা এবং শোচনীয় পরিণামের ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে জামাতের বিগত ১২৮ বছরের ইতিহাস। মৌলভি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী, পণ্ডিত লেখরাম, পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম প্রমূখ বিরোধীদের থেকে শুরু করে এ যুগের ফেরাউন জিয়াউল হক পর্যন্ত এবং তারপরে আরো কিছু মিথ্যাবাদী ও কাফের আখ্যাদানকারীদের পরিণতির ঘটনা বর্ণনা করা সীমিত পরিসরে সম্ভব হবে না। কাজেই দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকজন বিরোধীর পরিণাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

মৌলভি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভি:
বিরোধীদের মাঝে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নেতা হিসেবে পরিচিত এবং 'ইশা'আতুস সুন্নাহ্' পত্রিকার সম্পাদক মৌলভি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভীর নামটি সর্বপ্রথমে আসে। সে তার পত্রিকা ইশা'আতুস সুন্নাতে এই ঘোষণা দিয়েছিল, "আপন বৈশিষ্টের কারণে এই ফিত্নাকে (না'উযুবিল্লাহ্ আহমদীয়াতকে) অপনোদন, এর মূলোৎপাটন এবং এর বর্তমান জামাতকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো ইশা'আতুস সুন্নাহ্ পত্রিকার দায়িত্ব"। *(ইশা'আতুস সুন্নাহ্ , ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:১৩, ১৮৯২ ইং)*

এমনকি সে একথাও বলেছিল যে, "আমি মির্যাকে সুখ্যাতির চূড়ায় উঠিয়েছি আর আমিই তাকে ভূপাতিত করব"। তখন খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ইলহামের মাধ্যমে এই শুভ-সংবাদ দান করেন : **"ইন্নি মুহীনুন মান আরাদা ইহানাতাকা"** অর্থাৎ– 'যে ব্যক্তি তোমাকে অপদস্থ করতে চাইবে আমি তাকে অপদস্থ করব।' সুতরাং ইতিহাস স্বাক্ষী মৌলভি মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী তার এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে কেবল ব্যর্থই হয় নি বরং তাকে জীবনের গোধূলীলগ্নে সীমাহীন লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সইতে হয়েছে। আর তার সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে এই স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হয়েছে যে, আমার ছেলেরা নির্বুদ্ধিতা ও দুষ্কৃতিপরায়ণতার চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। আমার সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয়-স্বজন শরীয়ত পরিপন্থী এবং ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করা থেকে অস্বীকারে অটল রয়েছে। কেউ কেউতো আমার মুখের উপরে সোজা সাপটা বলে দিয়েছে যে, তুই আমাদের পিতা না এবং কেউ কেউ অগোচরে বলে যে, এই ব্যক্তি আবার আমাদের কেমন পিতা?" *(ইশা'আতুস সুন্নাহ্, ২২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৪)*

মৌলভি সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী:
বিরোধীদের তালিকাতে এরপরেই আহ্লে হাদীসের আলেম মৌলভি সানাউল্লাহ্ অমৃতসরীর নামটি চলে আসে। সে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং আহমদীয়া জামাতের চরম বিরোধীতা করেছে এবং বিভিন্ন ধরণের বিরোধীতামূলক ষড়যন্ত্র করতে থাকে। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর সময় সে 'আখবারে উকিল' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিখে যে, "আমাকে কেউ বললে আমি খোদা তা'লার নাম নিয়ে এই কথা বলতে প্রস্তুত যে, মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হলে মির্যার রচিত সকল বই পুস্তক সমুদ্রে নয়তো জ্বলন্ত কোন চুলাতে যেন ছুঁড়ে ফেলে। শুধুমাত্র এতটুকুই নয় বরং ভবিষ্যতে কোন মুসলমান অথবা কোন অমুসলমান ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে কিংবা ইসলামের ইতিহাসে যেন তাকে স্থান না দেয়"। *(আখবারে উকিল, ১৩ই জুন ১৯০৮)*

কিন্তু খোদা তা'লার অমোঘ ও চিরন্তণ তক্দীর অনুযায়ী আত্মমর্যাদা তাঁর প্রেমাস্পদের জন্য যেন আবারো জেগে উঠল। অসংখ্য গ্রন্থে সাজানো মৌলভি সাহেবের গ্রন্থসম্ভার সে নিজের চোখের সামনে মুহূর্তেই জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখেছে। আর তাই নয় বরং এই ঘটনা তার জন্য এতটাই পীড়াদায়ক ছিল যে, সে এই ব্যথা বেশী দিন বয়ে চলতে পারে নি; এমনকি তা তার মৃত্যুর কারণ সাব্যস্ত হয়েছিল।

সুতরাং মৌলভি আব্দুল মজীদ সাহেব সোহ্রাওয়ার্দি দেশ বিভাগের গণ্ডগোলের সময় অমৃতসরের অবস্থার বিবরণ শেষে মৌলভি আব্দুল্লাহ্ সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী সম্পর্কে সীরাতে সানায়িতে এভাবে বর্ণনা করেন: "মৌলানা সাহেব শহরের শীর্ষস্থানীয় বিত্তবানদের অন্যতম। লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র তার বাড়িতে ছিল। হাজার হাজার টাকা নগদ আর সহস্র টাকার অলংকারাদি সিন্দুকে গচ্ছিত অবস্থায় ছিল। হাজার হাজার টাকার বই পুস্তক ছিল। মূল্যবান কাগজপত্রের কোন কমতি ছিল না, কিন্তু মৌলানা সাহেব কোন কিছুকেই আক্ষেপের দৃষ্টিতে দেখেন নি। তার জীর্ণশীর্ণ পোশাকের পকেটে পঞ্চাশ টাকা ছিল মাত্র। এই অবস্থাতেই পরিবার পরিজনসহ সেই বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। বাড়ি ছাড়া মাত্রই একদল বখাটে লুটেরা ছেলে হামলে পড়ে আর তারা শুধুমাত্র সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় ওঁত পেতে ছিল। তারা সুযোগ পাওয়া মাত্রই সবাই একসাথে সমস্ত অলংকারাদি, প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। তাবৎ জিনিসপত্র লুটপাটের পরে তার প্রাসাদতুল্য ঐ বাড়িটির প্রতি তাদের লোভাতুর দৃষ্টি পড়ল । সারা জীবনের চেষ্টা, শ্রম ও উপার্জনের বিনিময়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা বহু দুর্লভ এবং মহামূল্যবান বই পুস্তকের সম্ভারে সাজানো তার সেই বিরাট গ্রন্থাগারটি তারই সামনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বই পুস্তক জ্বলে যাওয়ার দু:খ তার কাছে একমাত্র সন্তানের শাহাদাতের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। এগুলো তার সারা জীবনের সঞ্চয় ছিল। এগুলোর মধ্যে কিছু অত্যন্ত দুর্লভ ছিল বরং দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল। এই যন্ত্রণা তার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। পরিশেষে তার মৃত্যুর কারণ বলতে দু'টি কারণই ছিল, প্রথমত: একমাত্র সন্তানের আকস্মিক মৃত্যু এবং দ্বিতীয়ত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ মহামূল্যবান গ্রন্থ সম্ভার হারানোর যন্ত্রণা। অতএব এই দুইটি যন্ত্রণা স্বল্প সময়ের মধ্যে তার জীবননাশী সাব্যস্ত হয়েছিল।" *(সীরাতে সানাঈ, পৃষ্ঠা: ৩৯০)*

যে ব্যক্তি হযরত আক্দাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তাবৎ বই পুস্তক জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য মুসলমানদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিল সেই ব্যক্তির গ্রন্থাগার জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। এক কথায় একই বিষয় তার জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়াল। এটিই ঐশী তকদীর। ঐশী সমর্থন সর্বদা ঐশী পুরুষরাই লাভ করে।

আব্দুল্লাহ্ আথম:
পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম সেই দুর্ভাগা ব্যক্তি যে ইসলাম এবং ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য ১৮৯৩ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর সাথে মুনাযেরা (ধর্মীয় তর্কযুদ্ধ) করেছিল, যা "জঙ্গে

মুকাদ্দাস" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রয়েছে। এই মুনাযেরাতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের নিরঙ্কুষ বিজয় দান করেছেন। এই পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম তার রচিত 'আন্দ্রুনা বাইবেল'-এ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–কে দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করেছে (নাউযুবিল্লাহ্)। এর ফলে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) রসূল প্রেমের আবেগে আপ্লুত হয়ে খোদা তা'লার দরবারে ফরিয়াদ জানান, আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিকট ইলহামের মাধ্যমে একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেনঃ

"বিতর্কের দিন থেকে এক মাস গণনা করে পনের মাস সময়ের মধ্যে তাকে হাবিয়া (দোযখে)-তে নিক্ষেপ করা হবে এবং সে সীমাহীনভাবে অপদস্থ হবে। তবে তা কেবলমাত্র সত্যেরপানে প্রত্যাবর্তন না করার শর্তেই প্রযোজ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য খোদায় বিশ্বাসী তাঁরই সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে।" *(জঙ্গে মুকাদ্দাস, সর্বশেষ বিলিপত্র, রুহানি খাযায়েন ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯১,২৯২)*

এই ভবিষ্যদ্বাণী এতটাই ভীতিপ্রদ ছিল যে, আব্দুল্লাহ্ আথম আতঙ্কিত হয়ে গেল। এটি ছিল সত্যের প্রতি নতি স্বীকারের সূচনা মাত্র। আর এর পরে মৃত্যু অবধি সে পরবর্তীতে ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে একটি বারও কলম ধরে নি। সে এতটাই অনুতপ্ত ছিল যে, পরবর্তীতে সে খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস, মসীহ্র ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছিল। অবশেষে ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ তারিখে সে "নূর আফশাঁ" নামক পত্রিকাতে এই ঘোষণা দেয় যে, আমি খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত 'পুত্রত্ব' ও 'ঈশ্বরত্ব' মতবাদে একমত নই। আর তার ভয়ের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যা তিনি তাঁর আনওয়ারুল ইসলামের ২ ও ৩ নম্বর পৃষ্ঠাতে প্রকাশ করেছেন।

এদিকে ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত অংশ "সত্যের পানে প্রত্যাবর্তনের" শর্তকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে পনের মাস সময়সীমার ভিতরে মৃত্যুর কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল অন্যদিকে খৃষ্টানরা এই ঘটনাকে মিথ্যা বিজয় ভেবে জয়ঢাক বাজাতে শুরু করল। সভা সম্মেলন আর হৈ চৈ আরম্ভ করল। এই পরিস্থিতিতে খোদা তা'লার কাছ থেকে ইলহাম লাভ করে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আব্দুল্লাহ্ আথমকে এক হাজার টাকার পুরষ্কার ঘোষণা করে মুবাহালার চ্যালেঞ্জের আহ্বান করলেন। *(আনওয়ারুল ইসলাম পৃষ্ঠা:৬)*

এরপর আব্দুল্লাহ্ আথম এই আহ্বানে সাড়া দেয় নি। তাই তিনি (আ.) অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করেন। আব্দুল্লাহ্ আথমের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সৎ সাহস ছিল না, আবার তওবাও করে নি। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে তৃতীয় চ্যালেঞ্জ দিলেন যাতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তিনগুণ করেন এবং তাকে স্পষ্ট নিদর্শনের জন্য কসম খাওয়ার জন্য আহ্বান করেন।

পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম এই চ্যালেঞ্জে দু'টি কারণ দেখিয়ে অপারগতা প্রকাশ করে। প্রথমত: তার ধর্মে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ আর দ্বিতীয়ত: এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত মেয়াদে তিনি ভয় পেয়েছেন ঠিকই কিন্তু তা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাব এবং প্রতাপে নয় বরং খুন হওয়ার আশঙ্কাতে।

তারপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি ভিন্ন বিজ্ঞাপনে কারণ দু'টি উল্লেখ করে অর্থের পরিমাণ চার গুণ করেন এবং বলেন, খৃষ্টানরা তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললেও সে খোদার কসম খাবে না। কেননা সে নিজে খুব ভাল করে জানে যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। যা প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। আর সে কসম খেলে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশও পূর্ণ হবে। খোদা তা'লার সিদ্ধান্ত অমোঘ। *(বিজ্ঞাপন, ৩০ ডিসেম্বর ১৮৯৫)*

ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত চ্যালেঞ্জের বিপরীতে আব্দুল্লাহ্ আথম ধারাবাহিক মৌনতা অবলম্বনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিল যে, সে সত্যের পানে প্রত্যাবর্তন করেছিল। প্রকাশ্যে মৌখিকভাবে প্রত্যাবর্তনের কথা স্বীকার করে নি তাই আল্লাহ্ তা'লা অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়েন নি। আর সত্য গোপনের অপরাধে বিজ্ঞাপন প্রকাশের সাত মাসের ভিতরে ২৬ জুলাই ১৮৯৬ সনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের বিজয় এবং খৃষ্টীয় ধর্মের পরাজয় জগতের সামনে প্রতীয়মান হলো।

উল্লেখ্য, এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যের পানে প্রত্যাবর্তনের সাথে শর্তযুক্ত ছিল। তাই যতদিন সে এই শর্তে উল্লেখিত সময়সীমাকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছে ততদিন পর্যন্ত তাকে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। আর এই সময়ে যতদিন সে জীবিত ছিল কার্যতঃ যেন এক নরকেই বসবাস করছিল কিন্তু সত্য গোপনের অপরাধে সবশেষে ঐশী শাস্তি থেকে সে পরিত্রাণ পায় নি এবং ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছে।

ড. জন আলেকজান্ডার ডুই:

আলেকজান্ডার ডুই ছিল আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ মানুষ। সে মূলতঃ অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী ছিল; পরবর্তীতে আমেরিকাতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯২ সনে ধর্মীয় বক্তৃতা দেয়া আরম্ভ করে আর সে এই মর্মে ঘোষণা দেয় যে, সে বিনা ঔষধে মানুষকে সুস্থ্য করতে পারে।

১৯০১ সালে সে দাবী করে যে, সে মসীহ্র (ঈসা) দ্বিতীয় আগমণের জন্য এলিয়া স্বরূপ। এই দাবীর ফলে তার অনেক জাগতিক উন্নতি হয়। সে জমি ক্রয় করে, তাতে **'জিয়ন সিটি'** নামে একটি শহর গড়ে তোলে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার ভক্তের সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে যায়। ১৯০২ সনে সে তার স্বভাবসুলভ আচরণ হিসেবে প্রচার করে যে, যদি মুসলমানগণ খিষ্টধর্ম গ্রহণ না করে তবে তাদের সকলকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তার এই ঘোষণার সংবাদ পাওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। যেখানে তিনি (আ.) ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, খ্রিষ্টধর্মের সত্যতা প্রকাশের জন্য কোটি-কোটি মানুষের জীবন নেয়ার প্রয়োজন কি? আমি খোদার পক্ষ থেকে

প্রেরিত মসীহ। আমার সঙ্গে মোবাহালা (ধর্মীয় প্রার্থনা-যুদ্ধ) করে দেখ। ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯০৩ সালের শেষ পর্যন্ত ইউরোপ-আমেরিকার প্রিন্ট মিডিয়াতে এটি ছিল তুমুল আলোচিত বিষয়। কমপক্ষে ২০-২৫ লক্ষ মানুষ এই মোবাহালা সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকবে।

ডুই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইসলামের উপরে ভয়াবহ আক্রমণ করা আরম্ভ করে। ১৯০৩ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী, সে এই সংবাদ ছাপে যে, 'আমি খোদার কাছে দোয়া করি যেন সেদিন অতি শীঘ্রই আসে যখন ইসলাম ধরাপৃষ্ঠ থেকে মিটে যাবে; হে খোদা তুমি ইসলামকে ধ্বংস কর।' তার এ ধৃষ্টতা লক্ষ্য করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'ডুই এবং পিগট সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ' বিষয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তিনি লিখেন, 'ডুইকে আমি পূর্বেও মোবাহালার আহ্বান জানিয়েছিলাম; কিন্তু সে এখনো এর কোন উত্তর দেয় নি; তাই আজ থেকে তাকে উত্তরের জন্য সাত মাস সময় দেয়া হচ্ছে।' ইউরোপ ও আমেরিকার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ খবরের কাগজগুলোতে এই বিজ্ঞাপনের সারসংক্ষেপ ফলাও করে ছাপা হয়। যেমন, গ্লাসগো হেরাল্ড, আমেরিকার নিউইয়র্ক কমার্শিয়াল এডভারটাইজার এই খবর ছেপেছে। আর এই বিজ্ঞাপন যখন প্রকাশিত হয়েছে তখন ডুই এর বৃহস্পতি ছিল তুঙ্গে। এককথায় স্বাস্থ্য, সম্পদ, দলীয়-শক্তি ও ক্ষমতা -এই চার ক্ষেত্রেই তার ছিল প্রাচুর্য্য।

মানুষ কখনো কখনো অদ্ভুত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। ডুই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে অস্বীকার করেও ঠিক তাই করলো। সে চিন্তা করে নি যে, হযরত আকদাস পরিষ্কার ভাষায় লিখে দিয়েছেন, যদি সে ইঙ্গিতেও আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে তাহলে সে আক্ষেপের সঙ্গে আমার জীবদ্দশাতেই ধ্বংস হবে। এদিকে ডুই হযরত সাহেবকে (আ.) উল্টো 'কীট' আখ্যায়িত করে বলে, 'যদি আমি তার উপর পা রাখি তাহলে তাকে পিষ্ট করে দিতে পারি'- একথা বলে সে মূলত তার ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করে। আর সে যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে তাই হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তার বিরুদ্ধে লেখালেখি স্থগিত করে

وَانْتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

(সূরা আস সাজদা : ৩১)

ঐশী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকেন। অবশেষে খোদা তা'লা সেই পা বিকল করে দেন যা সে তাঁর উপর রেখে তাঁকে পিষ্ট করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিল। মসীহ্র উপর পা রাখবে বলে যে স্পর্ধা দেখিয়েছিল তা ছিল সুদূর পরাহত। তার পা মাটিতে রাখারও যোগ্য ছিল না। অর্থাৎ সে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে যায়। কিছু দিন পর উপশম হল ঠিকই কিন্তু দু'মাস পর ১৯শে ডিসেম্বর দ্বিতীয় আঘাতে তার অবশিষ্ট শক্তিও ধ্বংস হয়ে যায়। নিরুপায় হয়ে চিকিৎসার জন্য সে দূর দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে।

যেসব বিষয়ে সে অহঙ্কার দেখিয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমেই ঐশী ক্রোধ তাকে নীচ ও হীন প্রতীয়মান করেছে। অসুস্থ্য হয়ে শহর ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টি তার ভক্তদের হৃদয়ে সন্দেহের উদ্রেক করে। ক্রমেই থলের বিড়াল বের হতে থাকে। তার চলে যাওয়ার পর তারা তার গোপন কক্ষ থেকে মদের বোতল উদ্ধার করে, অথচ সে তার ভক্তদেরকে কঠোরভাবে মদ্যপান থেকে বারণ করতো, এমনকি ধূমপান থেকেও। তার স্ত্রী বলে, আমি চরম অভাবের যুগেও তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম; কিন্তু এটি দেখে আমি খুবই মর্মাহত হলাম যে, সে এক সম্পদশালী বৃদ্ধাকে বিয়ে করার জন্য একাধিক বিয়ে করা বৈধ বলে নতুন কথা ঘোষণা করছে। সত্যিকার অর্থে, এর মূলে রয়েছে তার বিয়ের বাসনা। পরবর্তীতে এটিও প্রকাশ পেল যে, সে শহরের কয়েকজন যুবতীকে গোপনে লক্ষাধিক টাকার উপঢৌকন দিয়েছে। তখন তারই সংগঠন তাকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করে।

ডুই এ সকল আপত্তি খণ্ডন করতে পারে নি। এদিকে বিক্ষুব্ধ ভক্ত তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। ডুই মামলা করে ব্যর্থ হয়, রোগের কষ্ট বেড়ে যায়; আর এসব কিছু সইতে না পেরে উন্মাদ হয়ে যায়। একদিন তার কয়েকজন ভক্ত তার বক্তৃতা শুনতে এসে দেখে যে, তার সারা শরীর ব্যাণ্ডেজে বাঁধা। সে তাদের বলে যে, এর নাম 'জীরি', সে সারা রাত শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, সে যুদ্ধে তার জেনারেল মারা গেছে এবং সে নিজেও আহত হয়েছে। তখন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, সে পাগল হয়ে গেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দ, **'সে আমার চোখের সামনে বড় আক্ষেপ ও দুঃখের সঙ্গে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে'**– ৮ই মার্চ ১৯০৪ সনে পরিপূর্ণতা লাভ করে। মৃত্যুর সময় তার সাথে শুধু চার ব্যক্তি ছিল। সর্বসাকুল্যে তার পুঁজি ছিল চৌত্রিশ টাকার মত। পাশ্চাত্যের লোকদের জন্য এটি একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। আমেরিকার পত্রিকা 'ডানভিল গেজেট', 'ট্রুথ সিকার' সহ আমেরিকার বস্টনের পত্রিকা 'বস্টন হেরাল্ড' এ কথা লিখেছে যে, ডুইয়ের মৃত্যুর পর ভারতীয় নবীর খ্যাতি তুঙ্গে। মোটকথা, সত্যান্বেষীদের জন্য এটি একটি শিক্ষণীয় ঘটনা।

পণ্ডিত লেখরাম:

শুরুতেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা জরুরী যে, হিন্দুদের একটি ফিরকা বা দল হলো আর্য সমাজ। ইসলামের দুর্বল অবস্থা দেখে এই ফিরকার ধর্মীয় নেতারা মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছিল। লেখরাম পেশওয়ারী নামের এই ব্যক্তি ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জঘণ্য নোংরাভাষী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার তার সামনে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করা সত্ত্বেও সে ক্রমাগতভাবে সীমালঙ্ঘণ করে আর শুধু তাই নয় বরং সে পবিত্র কুরআনের নোংরা অনুবাদ প্রকাশ করতে থাকে এবং জনমনে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ উস্কে দেয়। তার মতে ধরাপৃষ্ঠে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তি হলো মুহাম্মদ (সা.) (নাঊযুবিল্লাহ্) এবং সবচেয়ে বাজে গ্রন্থ হলো কুরআন। এই ব্যক্তি বিতর্কের সময় মহানবী (সা.) সম্পর্কে অপালাপের ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করতে থাকে। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে এ কথা বলতে থাকে যে, আমাকে নিদর্শন কেন দেখাও না? সুতরাং হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তার সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেন। উত্তরে তাঁকে

জানানো হয়, "এ ব্যক্তি সম্পর্কে নিদর্শন হলো: তাকে অচিরেই ধ্বংস করা হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী ছাপার পূর্বে তিনি লেখরামকে বলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী ছাপা যদি তার জন্য কষ্টের কারণ হয়, তাহলে তা প্রকাশ করা হতে বিরতও থাকা যেতে পারে। সে উল্টো জবাবে লিখে , আপনি সানন্দে এটি প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে।" অবশেষে তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই মর্মে সংবাদ পেয়ে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন যে, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ থেকে ছয় বছরের ভেতর লেখরামের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবতীর্ণ হবে, যার পরিণাম হবে মৃত্যু। একইসঙ্গে আরবী ভাষায় এই ইলহামও ছাপেন, যার অর্থ এমন যে, **"এই ব্যক্তি সামেরীয় গোবৎস তুল্য এক বাছুর যা অর্থহীন চিৎকার করে; তার ভেতর আধ্যাত্মিকতার লেশ মাত্র নেই। এর উপর এক শাস্তি অবতীর্ণ হবে।"** (তাযকিরা পৃ: ২২৯, চতুর্থ সংস্করণ)

এরপর তিনি (আ.) লিখেছেন, "এখন আমি সকল ধর্মের প্রত্যেক ফির্কার সামনে প্রকাশ করতে চাই যে, আজ ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ থেকে ছয় বছরের মধ্যে যদি সাধারণ রোগব্যাধি হতে ভিন্ন অলৌকিক কোন শাস্তি অবতীর্ণ না হয়, আর তা যদি ঐশী ত্রাস নিজের ভিতর না রাখে, তাহলে ধরে নিও, আমি খোদার পক্ষ থেকে নই। এর কিছুকাল পর তিনি দ্বিতীয় আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন, যাতে এই ব্যক্তির ধ্বংস সম্পর্কে সমধিক ব্যাখ্যা ছিল। তিনি (আ.) বলেন-

"আল্লাহ্ তা'লা আমাকে শুভসংবাদ দিয়েছেন যে, তুমি একটি ঈদের দিন দেখবে, আর সেই দিনটি ঈদের দিনের সঙ্গে সন্নিবেশিত হবে।" এভাবে তিনি (আ.) **'কিরামাতুস সাদেকীন', 'বারাকাতুদ্ দোয়া', 'আয়ানায়ে কামালাতে ইসলাম'** পুস্তকসমূহে ক্রমাগতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করতে থাকেন। যেখানে তাঁকে স্পষ্ট সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, (১) এই শাস্তির পরিণাম হবে মৃত্যু। (২) আর তা হবে ৬ (ছয়) বছরের ভেতর। (৩) দিনটি ঈদের দিনের সঙ্গে সন্নিবেশিত হবে অর্থাৎ, ঈদের পূর্বের বা পরের দিন হবে। (৪) তার সঙ্গে সেই ব্যবহারই করা হবে যা সামিরীর বাছুরের সাথে করা হয়েছিল, তাহলো বাছুরকে টুকরো টুকরো করে পুড়িয়ে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (৫) তার ধ্বংসের জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল যার চোখ রক্তিম। (৬) সে মহানবী (সা.)-এর তরবারিতে টুকরো টুকরো হবে। এসব ভবিষ্যদ্বাণীর পাঁচ বছর পরে ঈদুল ফিতরের দিন যা জুমু'আর দিন ছিল তার পরবর্তী দিন অর্থাৎ শনিবার আসরের সময় লেখরাম অজ্ঞাত ব্যক্তির ধারালো খঞ্জরের আঘাতে গুরুতর আহত হয় এবং মারা যায়।

ইলহামে যেভাবে বলা হয়েছিল বাস্তবেও হুবহু তাই ঘটেছে। দিন-ক্ষণ, লক্ষণাবলি আগাগোড়া সবকিছু সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। যেন জীবন্ত খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন। ইলহামগুলোতে উল্লেখিত ছয়টি বিষয়ই পরিপূর্ণরূপে প্রতীয়মান হয়। যেমন তার অবস্থা সামেরীয় গোবৎস তুল্য হবে। সত্যিকার অর্থে যেভাবে সামিরীর গোবৎসকে শনিবারে টুকরো টুকরো করা হয়েছে, তাকেও শনিবারেই টুকরো টুকরো করা হয়, তারপর ছাই নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে লেখরামও হিন্দু রীতি অনুযায়ী প্রথমে তাকে চিতায় পোড়ানো হয়, পরে তার ছাই নদীতে ফেলে দেয়া হয়। তার খুন হওয়ার ঘটনাটি নিম্নরূপ:

এক ব্যক্তি তার কাছে আসে যার সম্পর্কে কথিত আছে যে, তার চোখ থেকে যেন রক্ত ঝরছিল। সে লেখরামকে বলে যে, সে ইসলাম ধর্ম থেকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হতে চায়। মানুষের শত বারণ সত্ত্বেও লেখরাম তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দেয়। সে তাকে আর্য ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য ঘটনাক্রমে সে-দিনটিকেই নির্ধারণ করে যে দিন এই ঘটনা ঘটে, আর তা ছিল শনিবার। ঘটনার সময় লেখরাম কিছু একটা লিখছিল। সে সেই অপরিচীত ব্যক্তিকে কোন বই দিতে বললে, সে ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ করছিল যে, সে বই আনছে, কিন্তু কাছে আসতেই সে লেখরামের পেটে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেয়, আর তা বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে ঝাঁকুনি দেয় যেন অন্ত্র কেটে যায়।

লেখরামের নিকটাত্মীয়দের বিবরণ অনুযায়ী এরপর সে অদৃশ্য হয়ে যায়। লেখরাম ঘরের উপরের তলায় ছিল। আর নিচে দরজার কাছে তখন অনেক মানুষ সমবেত হয়; কিন্তু কেউ ঘাতককে নিচে নামতে দেখেছে বলে সাক্ষ্য দেয় নি। লেখরামের স্ত্রী ও তার মায়ের বিশ্বাস এটিই ছিল যে, সে ঘরের ভেতরেই আছে।

কিন্তু, তাৎক্ষণিকভাবে তল্লাশী চালানো সত্ত্বেও তাকে কেউ খুঁজে পায় নি। মোটকথা, লেখরাম চরম দু:খজনক শাস্তির শিকার হয়ে মুহাম্মদ (সা.)-এর কল্যাণময় সত্তাকে নিয়ে অপলাপকারীদের জন্য এক শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

এছাড়া আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারী, যুলফিকার আলী ভুট্টু, জিয়াউল হক্ব প্রমুখ যারা মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর জামা'তের বিরোধী হিসেবে দাঁড়িয়েছিল, আর তাঁর জামাতকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল উল্টো তারাই পরিশেষে ধ্বংস হয়ে যায়।

صاف دل کی کثرت اعجاز کی حاجت نہیں
اک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار

ভুরি ভুরি দলিল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই স্বচ্ছ হৃদয়ের খোদাভীতি থাকলে একটি নিদর্শনই যথেষ্ট!

এই বিষয়গুলো যেভাবে সত্যান্বেষীদের জন্য গভীর চিন্তা ভাবনার উপকরণ, একইভাবে আহমদীদের জন্যও জ্ঞানচর্চা এবং ঈমান বৃদ্ধির কারণ। তাই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে নিজ নিজ স্থান থেকে ইতিহাসের এ সমস্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভের তৌফিক দান করুন। (আমিন)

নবীজী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

মাওলানা হাজারী আহমদ আল-মুনিম
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

অর্থাৎ 'তুমি (লোকদেরকে) বলে দাও- যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস, তবে এস আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন'। *(সূরা আলে ইমরান:৩২)*

আল্লাহ্ তা'লার এই মহান বাণী অনুসারে মহান আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করেছেন এই যুগে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক ও দাস হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই 'উসওয়ায়ে হাসানাহ্'কে অনুসরণ করেছেন এবং তাঁর (সা.) নির্দেশাবলীকে শিরোধার্য করেছেন। এই প্রবন্ধে এরূপ কয়েকটি ঘটনা তাঁর (আ.) জীবনী থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

হযরত ভাই আব্দুর রহমান কাদিয়ানী সাহেব বর্ণনা করেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খুব যত্নের সাথে সুন্দর করে ওযু করতেন; ওযুর প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুতেন, মাথার সামনের অংশ মাসাহ্ করতেন, দাড়িতে খিলাল করতেন, কখনও মোজার উপর মাসাহ করতেন, কখনও মোজা খুলে পা ধুতেন আর ধোয়ার সময় পায়ের আঙুলের ফাঁকগুলোও হাত দিয়ে পরিষ্কার করতেন, দাঁত-মাড়ি আঙুল দিয়ে মাজতেন।" হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন, "হুযুর (আ.) সাধারণত সারাক্ষণই ওযুর অবস্থায় থাকতেন, অসুস্থতা বা অন্য কোন সমস্যা না থাকলে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে এসেই ওযু করে নিতেন। হুযুর (আ.) মেসওয়াকও খুব পছন্দ করতেন এবং দিনে কয়েকবার মেসওয়াক করতেন, নামায ও ওযুর সময় ছাড়াও বিভিন্ন সময় মেসওয়াক করতেন।" হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, মহানবী (সা.)-ও এমনটি করতেন, তাই আমাদেরও এদিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

হযরত মৌলভী মুহাম্মদ ইব্রাহীম বাকাপুরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) আসরের নামায পড়ানোর সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইমামের অনুকরণের এমন উন্নত আদর্শ প্রদর্শন করেন যা আমাদের প্রায় কেউই করতে পারে নি। হযরত খলীফা আওয়াল (রা.) নামায পড়াচ্ছিলেন, তার বার্ধক্যের কারণে দ্বিতীয় রাকাআতে উঠার সময় কিছুটা দেরি করছিলেন। আমরা সব মুক্তাদি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেভাবেই বসে থাকলেন, আর যেভাবে মৌলভী সাহেব ধীরে ধীরে দাঁড়ান, তিনিও সেভাবে ধীরে ধীরে দাঁড়ান।"

হযরত আব্দুস সাত্তার সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর দাবীর পূর্বে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাযে ইমামতি করতেন। আমরা কেবল তিনজন তাঁর সাথে নামায পড়তাম। তিনি (আ.) অত্যন্ত বিনয়, বিগলন, ক্রন্দন ও কাকুতি-মিনতির সাথে নামায পড়তেন, যেমন কি-না কোন বাচ্চা তার বাবা-মার কাছে কেঁদে কেঁদে কোন জিনিস চায়। তাঁর এমন নামাযের ফলে আমাদের মনে গভীর প্রভাব পড়ত। মৌলভী মুহাম্মদ দীন সাহেব বলেন, হযরত আকদাস পাঁচবেলা বাজামাত এবং প্রথম সময়ে নামায আদায় করতেন। ফজরের নামায আলো ফোটার আগেই পড়তেন, আর ইশার নামায যথেষ্ট দেরি করে পড়তেন।" হযরত আম্মাজান (রা.) বর্ণনা করেন, "মসীহ্ মওউদ (আ.) ফরয নামাযের আগের সুন্নত ঘরেই পড়তেন, আর ফরযের পরের সুন্নতও অধিকাংশ সময় ঘরে পড়তেন, কখনও কখনও মসজিদেই পড়তেন। তিনি (আ.) পাঁচবেলার নামায ছাড়া সাধারণত দুই সময়ে নফল পড়তেন। এক তো হল ইশরাকের নামায যা তিনি দুই বা চার রাকআত পড়তেন এবং মাঝে-সাঝে পড়তেন, আরেকটি হল তাহাজ্জুদ নামায যা তিনি সর্বদা পড়তেন এবং আট রাকাআত পড়তেন। তবে চরম অসুস্থতার সময় তাহাজ্জুদ পড়তে পারতেন না, কিন্তু তবুও তাহাজ্জুদের সময় উঠে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দোয়া করতেন; শেষ বয়সে শারীরিক দুর্বলতার কারণে অধিকাংশ সময় বসে বসে তাহাজ্জুদ পড়তেন। তিনি এত দীর্ঘ তাহাজ্জুদ পড়তেন যে কেউ যদি

কখনও লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর সাথে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়েও যেতেন, তবে তাঁর দু'রাকাআতেই ক্লান্ত হয়ে যেতেন।"

পেশাওয়ারের হযরত কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বর্ণনা করেন, "১৯০৪ সনে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মামলার কারণে গুরুদাসপুরে ছিলেন, তখন একবার রাতের বেলায় খুব বৃষ্টি শুরু হয়। তিনি (আ.) তখন ছাদে ছিলেন, বৃষ্টি শুরু হলে তিনি তাড়াতাড়ি চিলেকোঠায় ঢুকতে যান। কিন্তু ঢুকতে গিয়ে দেখেন মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেব ঠিক দরজা বরাবর দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়ছেন। এটি দেখে হুযুর (আ.) সেখানেই দরজার কাছে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সাহেবের নামায শেষ হওয়ার পর তিনি (আ.) চিলেকোঠায় প্রবেশ করেন।"

লাঙ্গরওয়ালনিবাসী মির্যা দীন মুহাম্মদ সাহেব অনেক ছোট বয়স থেকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে তাঁর দাবীরও পূর্বের যুগ থেকে আসা-যাওয়া করতেন। তিনি বলেন, "আমি হুযুরের সাথে ঘুমালে তিনি কখনোই আমাকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগাতেন না, কিন্তু ফজরের নামাযের জন্য অবশ্যই জাগাতেন। আর জাগানোর জন্য তিনি পানিতে নিজের আঙুল ডুবিয়ে হালকা পানির ছিটা দিতেন। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাকে জাগানোর জন্য ডাক না দিয়ে পানির ছিটা কেন দেন? জবাবে হুযুর (আ.) বলেন, কারণ মহানবী (সা.) এভাবেই ঘুম থেকে জাগাতেন।"

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটী সাহেব বর্ণনা করেন, "একদিন আসরের নামাযের সময় এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কিছুটা মৃদুস্বরে বলে, আমি কিছু সাহায্য চাই। সেদিন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কোন জরুরী কাজের তাড়া ছিল, আর অন্যদের কথাবার্তায় সেই ব্যক্তির কথা চাপা পড়ে যায়। নামাযের পর অন্যান্য দিনের মত সাহাবীদের সাথে সাধারণ কথাবার্তা শুরু হয়ে যায় এবং সেই ব্যক্তির দিকে তাঁর আর খেয়াল হয় নি। কিন্তু যখন ঘরে চলে যান তখন হঠাৎ তাঁর সেই ব্যক্তির কথা মনে পড়ে যায় এবং তিনি তাড়াতাড়ি ফেরত আসেন ও হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.)-কে সেই সাহায্যপ্রার্থীর খোঁজ করতে বলেন। সেই ব্যক্তি তো হুযুর (আ.) ঘরে যাবার পরই চলে গিয়েছিল, তাই মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) অনেক খুঁজেও তাকে পেলেন না। সন্ধ্যার সময় তিনি (আ.) নামাযের পর বসলে পরে সেই ব্যক্তি কাছে এসে হাজির হয় ও আবার সাহায্য চায়। তাকে দেখে হুযুর (আ.) ততক্ষণাৎ পকেট থেকে কিছু বের করে তার হাতে গুঁজে দিলেন, আর হুযুরকে দেখে মনে হল যেন অনেক বড় কোন বোঝা তাঁর উপর থেকে নেমে গিয়েছে। কয়েকদিন পর হুযুর (আ.) আলাপচারিতার মধ্যে বলেন, সেদিন যখন সেই সাহায্যপ্রার্থীকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন মনে হচ্ছিল আমার উপর যেন এক ভারী বোঝা চেপে বসেছে যা আমাকে খুবই বিচলিত করছিল। আমার এই ভয় হচ্ছিল যে আমার দ্বারা পাপ হয়ে গিয়েছে, আমি সাহায্যপ্রার্থীর কথা না শুনেই ঘরে চলে গিয়েছি। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া যে সেই লোক সন্ধ্যায় আবার এসেছে, নতুবা আল্লাহ্ জানে আমি এখনও কেমন উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতাম; আর আমি দোয়াও করছিলাম আল্লাহ্ তা'লা যেন তাকে ফেরত আনেন।"

হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন, "হুযুর (আ.) অনেক বেশি সদকা করতেন, আর এত গোপনে করতেন যে অধিকাংশ সময় আমিও জানতে পারতাম না। শেষদিকে যত টাকা আসত তার এক-দশমাংশ কেবল সদকার জন্য আলাদা করে রেখে দিতেন; এর মানে এই না যে, দশমাংশের চেয়ে বেশি সদকা দিতেন না, বরং এর চেয়েও বেশি দিতেন। আলাদা রাখার কারণ হল অনেক সময় অন্যান্য খরচ বেশি হলে মানুষের সদকার প্রতি মনোযোগ কমে যায়, কিন্তু আলাদা করে রেখে দিলে সেটা আর অন্য কাজে ব্যয় হয় না।"

একবার এক মৌলভী কাদিয়ানে এসে হুযুর (আ.)-এর সাথে বাহাস করে, হুযুর তার প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। যখন হুযুরের কথার কোন উত্তর আর দিতে পারল না তখন সে চুপ হয়ে গেল। হুযুর (আ.) তাকে প্রশ্ন করলেন, 'মৌলভী সাহেব, এখন তো আপনি বুঝতে পারলেন আর বিষয়টি আপনার কাছে স্পষ্ট হল'; মৌলভী জবাব দিল, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি– আপনিই দাজ্জাল (নাউযুবিল্লাহ্)! কারণ দাজ্জালের একটি বৈশিষ্ট্য হল সে অন্যদেরকে তর্কে পরাস্ত করবে।' তার এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে হুযুর (আ.) চুপ হয়ে গেলেন। মৌলভী চলে গেল। কিন্তু অমৃতসর গিয়ে সে একটি ইশতেহার ছাপাল এবং এতে সেই পুরো ঘটনা বর্ণনা করে যে আমি এই কথা বলেছি, অথচ এরপরও যখন তিনি ভেতরে চলে গেলেন তখন আমি তাকে একটি চিরকুট পাঠালাম যে আমি একজন অভাবী, আমাকে সাহায্য করুন। তিনি সাথে সাথে আমাকে ১৫ রূপি পাঠিয়ে দিলেন!' এটি আজ থেকে প্রায় সোয়াশ' বছর আগের কথা। মৌলভী সাহেব আরও লিখেন, মির্যা সাহেব অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি, আর তাকে যদি মুখের উপরও কটুকথা বলা হয় তবুও তিনি কিছু মনে করেন না।

হযরত মুন্সী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব বর্ণনা করেন, "একবার হুযুর (আ.) বায়তুল ফিকরে শুয়ে ছিলেন এবং আমি তাঁর পা টিপছিলাম। হঠাৎ লালা শরমপৎ বা লালা মালাওয়ামাল কেউ একজন জানালায় টোকা দিল। আমি উঠে জানালা খুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হুযুর (আ.) আমার চেয়েও দ্রুতবেগে উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিয়ে আবার নিজের স্থানে গিয়ে বসেন আর

বলেন, 'আপনি আমাদের মেহমান, আর মহানবী (সা.) বলেছেন যে, মেহমানকে সম্মান করা উচিত।"

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার হুযুর (আ.) কোন একটি প্রয়োজনে গুরুদাসপুরে যান। তখন তীব্র গরম চলছিল। রাতে হুযুরের (আ.) আরামের কথা খেয়াল রেখে বাড়ির খোলা ছাদে চারপায়া রেখে শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সে যুগে তীব্র গরমের সময় এমনটাই করা হতো। কিন্তু সেখানে কোন ছাউনি বা পর্দা ছিল না। যখন মসীহ্ মওউদ (আ.) শোবার জন্য সেখানে গেলেন তখন এই ব্যবস্থা দেখে অসন্তুষ্টির সাথে খাদেমদেরকে বললেন, 'তোমরা কি জান না? মহানবী (সা.) ছাউনিবিহীন ও রেলিংবিহীন ছাদে শুতে নিষেধ করেছেন।' যেহেতু সেই বাড়িতে আর কোন খোলা উঠান বা এরকম কোন ব্যবস্থা ছিল না, তাই তিনি (আ.) নিচের বদ্ধ-গরম কক্ষেই ঘুমাতে যান; তবু নিজের আরামের জন্য মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করেন নি।"

পাঞ্জাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের দিনগুলোতে হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটী সাহেব একদিন মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিভৃতে দোয়া করতে দেখেন। হুযুরের (আ.) দোয়ার অবস্থা দেখে তিনি খুবই আশ্চর্য হন, মসীহ্ মওউদ (আ.) এত বেদনার সাথে কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলেন যে, শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল কোন মহিলা বুঝি প্রসববেদনায় গোঙাচ্ছে। মৌলভী সাহেব কান পাতলেন যে, হুযুর (আ.) কী কারণে এভাবে কাঁদছেন, তখন শুনলেন যে, হুযুর (আ.) মানুষের প্লেগের শাস্তি থেকে মুক্তিলাভের জন্য এভাবে দোয়া করছেন। অথচ এই প্লেগের শাস্তি আল্লাহ্ তা'লা তাঁরই সত্যতার নিদর্শন হিসেবে প্রদর্শন করছিলেন।

ঘরোয়া বিষয়াদিতেও হুযুর (আ.)-এর আদর্শ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গীন ছিল। যেই খাবারই দেয়া হতো তিনি (আ.) তা খেয়ে নিতেন, আর কখনই কোন খাবারের খুঁত ধরতেন না। ঘরোয়া কাজ-কর্মের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর ছিলেন। প্রয়োজন পড়লে অত্যন্ত তুচ্ছ কাজও নিজে করে নিতেন, এতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। ঘরের খাটপত্র বা অন্যান্য আসবাব সরানো, বিছানা তৈরি করা বা অতিথির জন্য খাবার ইত্যাদি প্রস্তুত করে ট্রেতে করে নিয়ে যাওয়া ও পরিবেশন করা ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক কাজ তিনি অকপটে করতেন। অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাবের সময় নিজে উঠানে দাঁড়িয়ে ড্রেন পরিষ্কারের কাজ তদারকি করতেন আর কখনো কখনো নিজ হাতে পানি-ফিনাইল ইত্যাদি ঢেলে দিতেন। যদি হযরত আম্মাজান কখনও অসুস্থ হতেন, তবে তিনি স্বয়ং তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন; চরম ব্যস্ততা সত্ত্বেও নিজে তার ঔষধপত্রের খোঁজ নিতেন, নিজে ওষুধ খাইয়ে দিতেন। হযরত আম্মাজান যখন বিয়ের পর নতুন নতুন কাদিয়ান এসেছেন, তখন তিনি তার পূর্বের অভ্যাসের কারণে রাতে ঘুমুতে যাবার সময় আলো জ্বালিয়ে ঘুমুতে যেতেন। এতে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘুম ভেঙে যেত আর তিনি আলো নিভিয়ে আবার ঘুমুতে যেতেন। এতে আবার আম্মাজানের ঘুম ভেঙে যেত, তিনি আবার আলো জ্বালিয়ে তারপর ঘুমুতে যেতেন। এভাবেই রাত কেটে যেত। এভাবে চলতে চলতে একসময় হুযুর (আ.)-এরও আলোতে ঘুমানোর অভ্যাস হয়ে যায়, আর অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, পুরো বাড়িতে সব স্থানেই কোন না কোন প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হতো। হযরত আম্মাজান হুযুর (আ.)-কে মাঝে মাঝে এটি স্মরণ করাতেন যে, আগে তো তিনি (আ.) আলো থাকলে ঘুমুতেই পারতেন না, আর এখন আলো না হলে তাঁর ঘুম আসে না। মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা শুনলেই হাসতেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে গিয়ে লিখেন, "তাঁর (সা.) ছায়ায় দশদিন চললে সেই জ্যোতি লাভ করা যায়, যা এর পূর্বে সহস্র বছরেও লাভ করা যেতো না।" মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও মহানবী (সা.)-এর এই নিষ্ঠাবান দাস ও প্রেমিকের মত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আদর্শ ও নির্দেশ অনুসারে চলার তৌফিক দিন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ঐশী জ্যোতিতে আলোকিত হবার সৌভাগ্য দিন। আমীন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিতে একজন আদর্শ ওয়াকেফে জিন্দেগী

মাওলানা নাসের আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানে বলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

অর্থাৎ "তোমাদের মাঝে এমন এক দল থাকা প্রয়োজন যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করতে থাকবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে আর অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে আর এরাই তারা যারা সফলকাম হবে।" *(সূরা আলে ইমরান: ১০৫)*

এপ্রসঙ্গে আল্লাহ্ কুরআনের অপর এক স্থানে বলেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ○

অর্থাৎ "মুমিনগণের সবার পক্ষে একযোগে বের হওয়া সম্ভব নয়। সূতরাং কেন তাদের প্রত্যেক জামাত থেকে একটি করে দল ধর্মের বুৎপত্তি লাভে বের হয় না যাতে তারা নিজ জাতির কাছে ফিরে এসে তাদের সতর্ক করে যেন তারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়।" *(সূরা তাওবা: ১২২)*

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে আল্লাহ্ তা'লা এমন এক দলের উল্লেখ করেছেন যারা ধর্মের তরে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। পূণ্যকে প্রতিষ্ঠা করে ও মন্দকর্ম থেকে বারণ করে এবং ইসলাম প্রচারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকেই কোন না কোনভাবে ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় খিলাফতের সময় এটি ধারাবাহিকতা পায়। জীবন উৎসর্গের যথারীতি ফরম পূর্ণ করা আরম্ভ হয়ে যায়। ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে জামেয়া আহমদীয়াকে আরো সু-শৃঙ্খল করা হয়, মোবাল্লেগদের দেশের বাইরে পাঠানো শুরু হয়, যারা তবলীগের ক্ষেত্রে অনেক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। জীবন উৎসর্গকারীদের ব্যবস্থাপনায় অন্য আরেকটি দলও আছে, কেবল মোবাল্লেগণ নন বরং ডাক্তার, শিক্ষক এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণও এই ময়দানে সেবা করে যাচ্ছেন।

এখন আমি আপনাদের সম্মুখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আকাঙ্খা তুলে ধরছি, তিনি (আ.) কী ধরণের জীবন উৎসর্গকারী চেয়েছেন? তিনি (আ.) বলেন,

"আমাদের এমন লোকের প্রয়োজন যারা কেবল মৌখিক নয় বরং আমলের মাধ্যমে কিছু করে দেখাতে পারে। জ্ঞানের মৌখিক দাবী কোন মূল্য রাখে না।" *(মালফুযাত, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৬৮২)*

এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, "আমি এখানে সমস্ত মোবাল্লেগ এবং যারা পৃথিবীর বিভিন্ন জামেয়া আহমদীয়ায় অধ্যায়ন করছেন তাদেরকেও বলতে চাচ্ছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই নির্দেশকে সব সময় নিজেদের দৃষ্টিতে রাখবেন। সর্বদা আত্ম-বিশ্লেষন করতে থাকুন, আমাদের জ্ঞান ও কাজে মিল আছে কি না। উপদেশ তো দিচ্ছি যে, নামাযে দুর্বলতা পাপ। অথচ নিজেরাই নামাযে দূর্বল। বিশেষত জামেয়া আহমদীয়ার যারা ছাত্র, তাদের মনে রাখা উচিত। কতক কর্মক্ষেত্রে এসে দুর্বলতা প্রদর্শন করে থাকেন, তাদেরও স্মরণ রাখা উচিৎ আর অন্যান্যদেরতো আমরা বলছি। বিভিন্ন জায়গায় যে অপসংস্কৃতি প্রচিলত রয়েছে যেমন, বিয়ে-শাদিতে অনেক অপসংস্কৃতি দেখা যায় এগুলো বিদআত। যুগখলীফা এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনা এগুলোর অনুমতি দেয় না এবং ধর্মও এগুলোর অনুমতি দেয় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কঠোরভাবে এগুলো নিষেধ করেছেন। তথাপি অনেকেই নিজের সন্তান বা আত্মীয়দের বিয়েতে সে বিষয়ে দৃষ্টি দেন না অথবা এমন বিয়েতে শামিল হয়ে যান যাতে এই অপসংস্কৃতি হচ্ছে। তারা সেখানে বসে থাকেন, অথচ তাদের বুঝান না এবং উঠেও আসেন না। সুতরাং এমনটি করা সঠিক নয়। স্মরণ রাখবেন! ধর্মের শিক্ষা এ জন্য অর্জন করছেন যেন আমল সম্পাদনকারী আলেম হতে পারেন।"

অত:পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "জীবন উৎসর্গকারীদের এমন হওয়া উচিৎ যে, তারা অহংকার এবং গর্ব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হবে।" *(মালফুযাত, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা:৬৮২)*

তাই প্রত্যেক জীবন উৎসর্গকারীদের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী দৃষ্টিপটে রেখে অহংকার এবং গর্ব থেকে

সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। এর জন্য নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্লেষণ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আমাদের যখন আত্মবিশ্লেষণ করার অভ্যাস গড়ে উঠবে তখন ইনশাআল্লাহ্ একটি পরিবর্তনও সাধিত হবে।

অত:পর তিনি (আ.) জীবন উৎসর্গকারীদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "আমার কিতাব সমূহের অধিক অধ্যয়নের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান পূর্ণমার্গে পৌঁছা আবশ্যক।" *(মালফুযাত, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৬৮২)*

এত অধ্যায়ন করুন যেন জ্ঞান পূর্ণ মার্গে পৌঁছে যায়। সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিতাব সমূহের অধ্যায়ন জামেয়ায় অধ্যয়নরত অবস্থায় এবং কর্মক্ষেত্রে অত্যধিক আবশ্যক। কেননা এটিই এ যুগে সঠিক ইসলামী শিক্ষার দিকে পথ প্রদর্শন করে।

অত:পর তিনি (আ.) বলেন, **"স্বল্পে তুষ্ট থাকাও একজন মোবাল্লেগ ও মুরুব্বীর জন্য আবশ্যক।"** তিনি (আ.) স্বল্পে তুষ্টির যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন সে সম্পর্কে বলেন, **"তারা যদি আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বল্পে তুষ্ট না থাকে তাহলে তাকে তবলীগের ক্ষেত্রে পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া সম্ভব নয়।"** *(মালফুযাত, খন্ড: ৫, পৃষ্ঠা: ৬৮২)*

অর্থাৎ যে স্বল্পে তুষ্ট থাকবে তাকে সেই তবলীগের কর্তৃত্ব দেয়া যেতে পারে, জীবন উৎসর্গের কর্তৃত্ব দেয়া যেতে পারে। তিনি (আ.) বলেন, "আঁ-হযরত (সা.)-এর সাহাবীগণ এমন স্বল্পে তুষ্ট ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন যে, অনেক সময় কেবল গাছের পাতা খেয়েই তারা দিন অতিবাহিত করতেন।" *(মালফুযাত খন্ড: ৫ পৃষ্ঠা: ৬৫৮)*

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মা্ওউদ (আ.)-এর দোয়া এবং আকাঙ্খাকে পূর্ণতা দান করে স্বীয় ফযলে তাঁর জামাতে এমন বুযূর্গ মোবাল্লেগদের দান করেছেন যাদের স্বল্পে তুষ্টি ঈর্ষার যোগ্য ছিল।

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। আমাদের একজন মোবাল্লেগ ছিলেন হযরত সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ সাহেব। তিনি তাঁর ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, "আমি লাগাতার আঠার বছর ইন্দোনেশিয়ায় কাজ করেছি আর আল্লাহ্র ফযলে কখনো কারো কাছে হাত পাতিনি। নিজের পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রেখেছি। সামান্য ভাতা দিয়ে জীবনধারণ করতাম, কষ্টেই দু'বেলার খাবার জুটত। নিজের প্রত্যেক প্রয়োজনে স্বীয় প্রভুর সমীপে ঝুঁকতাম আর তিনি আমার সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন। আঠার বৎসর পর যখন আমার ফেরত আসার সময় হলো, তখন আমি অনেক আনন্দিত ছিলাম। সামুদ্রিক জাহাজে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। (তিনি) বলেন, আমার নিকট পুরনো একটি শেরওয়ানি ছিল আর এক-দু জোড়া ধোয়া সেলওয়ার কামিয ছিল, আর কিছুই ছিল না। তিনি বলেন, আমি সামুদ্রিক জাহাজে ভ্রমণ করছিলাম, উড়োজাহাজতো কল্পনাই করা যেত না। পথিমধ্যে মনে হল, আমি এতদিন পর দেশে ফিরত যাচ্ছি অথচ আমার নিকট নতুন কোন কাপড়ও নেই যা পরিধান করে আমি রাবওয়াহ্ রেল ষ্টেশনে নামব। সে সময় মোবাল্লেগগণ করাচি এসে সেখান থেকে ট্রেনে রাবওয়াহ্ পৌঁছতেন। আমি এই চিন্তা এবং দোয়ায় রত ছিলাম। (তিনি বলেন), আমার এ ভাবোদয় হল যে, আমার হৃদয়ে এ ধরণের আকাঙ্খাও পোষণ করা ঠিক হয় নি, এটি ওয়াক্ফের রূহ পরিপন্থী। তিনি বলেন, আমি এর কারণে অনেক তওবা এবং ইস্তোগফার করলাম। কয়েকদিন পর জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দরে থামল। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখছিলাম। আমি এক জন ব্যক্তিকে একটি থলে নিয়ে জাহাজে উঠতে দেখি, তিনি সরাসরি ক্যাপ্টেনের সমীপে এসে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, ক্যাপ্টেন তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আমার সাথে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন এবং বললেন, তিনি আহমদী আর সেলাইয়ের কাজ করেন। তিনি বলেন, আমি যখন আল ফযলে পড়লাম, 'আপনি আসছেন আর রাস্তায় সিঙ্গাপুর থামবেন তখন আমার আকাঙ্খা হল আমি আপনার নিকট কোন তোহ্ফা উপস্থাপন করি, আমি আপনার ছবি দেখেছিলাম। (শরীরের) উচ্চতার অনুমান ছিল। আমি আপনার জন্য দুই জোড়া কাপড় সেলাই করেছি, একটি শেরওয়ানি আর একটি পাগড়ি তৈরী করেছি। আমি পেশায় একজন দর্জি, তাই ভাবলাম এগুলোই পেশ করতে পারি, আপনি এগুলো গ্রহণ করুন।' হযরত শাহ্ সাহেব বলেন, এটি শুনে আমার চোখে অশ্রু চলে এলো, আমার আকাঙ্খাকে পূর্ণ করার জন্য আমার খোদা কিভাবে একজন আহমদীকে যাকে আমি চিনি না আর তিনিও আমাকে চেনেন না, তার হৃদয়ে এই ধারণা সৃষ্টি করলেন। তিনি মুরুব্বী ও মোবাল্লেগদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, মোবাল্লেগ যদি কেবল আল্লাহ্র দরবারে অবনত থাকে আর কারো সম্মুখে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত না করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য থেকে তার জন্য দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করে থাকেন। কেবল মোবাল্লেগদের নয়, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক জীবন উৎসর্গকারীদের সাথে এ আচরণ করে থাকেন। আজও আপনারা কর্মক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার ফযলের এ দৃশ্য অবলোকন করে থাকবেন।"

অত:পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একজন জীবন উৎসর্গকারীর বরাতে বলেন, "তাঁরা যেন সফরের কাঠিন্য সহ্য করতে পারেন।" *(মলফুযাত ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬৮৪, নতুন এডি:)*

সফরের দুঃখ-কষ্ট এবং কাঠিন্যকে সহ্য করা এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সংবাদ ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রচার করতে না পারলে একজন ওয়াক্ফে জিন্দেগী তার মূল লক্ষ্যই অর্জন করতে পারবে না। তাই একজন সফল ওয়াকফে জিন্দেগী হতে হলে সফরের কাঠিন্য সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে।"

আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, "একজন জীবন উৎসর্গকারীকে নিজের আকাঙ্খার কুরবানী দিতে হয়, কাঠিন্যও অতিক্রম করতে হয়, কষ্টেরও সম্মুখীন হতে হয় আর যেভাবে আমি বলেছি, কতক জায়গায় আজও এ দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই এবং দেখেছি। জামা'ত নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী জীবন-উৎসর্গকারীদের সুবিধা দেয়ার চেষ্টা করে আর তা করা উচিত। কিন্তু পৃথিবীতে যেভাবে অর্থনৈতিক দূরবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে গরীব দেশসমূহে যে অর্থনৈতিক খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে চেষ্টা সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধির মোকাবেলা করা কঠিন। কিন্তু একজন মুরুব্বী, একজন জীবন-উৎসর্গকারীর সম্মান এতেই নিহিত যে, কারো সম্মুখে সে নিজের সমস্যার কথা প্রকাশ করবে না। যে অশ্রু ঝরাবার রয়েছে তা খোদা তা'লার সামনে ঝরান, তাঁর কাছে চান। পূর্ববর্তী বুযুর্গদের যে উদাহরণ রয়েছে আজও খোদা তা'লার ফযলে জামাতে সে কুরবানীসমূহ বিদ্যমান আছে। তবে কতক অধৈর্যশীলও আছে, যারা ওয়াক্ফ ভঙ্গ করে বসে। অন্যদের দেখে যখন নিজের আকাঙ্খাকে প্রসারিত করা হয় তখন এ অবস্থাই হয়ে থাকে। এতে সমস্যা আরো বেড়ে যায়। আপনারা অন্যদের দেখে যখন নিজেদের আকাঙ্খাসমূহকে প্রসারিত করবেন তখন হয়তো ওয়াক্ফ ভঙ্গ করবেন নয়তো ঋনী হয়ে যাবেন। সুতরাং নিজের সামর্থ্যের ভিতর থাকাই একজন ওয়াকেফে জিন্দেগীর জন্য উত্তম। এ প্রসঙ্গে আমি জীবন-উৎসর্গকারীগণের স্ত্রীদেরকেও এটি বলব, তারাও যেন নিজেদের মাঝে স্বল্পতুষ্টির অভ্যাস গড়েন, নিজের স্বামীদের কাছে যেন এমন কোন দাবী না করেন, যা পূর্ণ হবে না, আর জীবন উৎসর্গকারীকে পরীক্ষার মাঝে ফেলে দেবে। সুতরাং যে মহান কাজ এবং মহান চেষ্টা-প্রচেষ্টার জন্য জীবন উৎসর্গকারী বিশেষ করে মোবাল্লেগ, মুরুব্বীগণ নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন, তাদের স্ত্রীদের উচিত তারাও যেন তার সেই চেষ্টা-প্রচেষ্টায় সাহায্যকারী হয়।"

একজন মোবাল্লেগ এবং মুরুব্বীর সর্বদা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই নির্দেশকে সামনে রাখা উচিত, তিনি (আ.) মাদ্রাসা আহমদীয়ার গোড়াপত্তনের সময় বলেন, "এ মাদ্রাসা ইসলাম প্রচারের মাধ্যম হোক, এ থেকে এমন আলেম এবং জীবন উৎসর্গকারী ছেলেরা বেরিয়ে আসুক যারা পার্থিব চাকুরী এবং উদ্দেশ্যকে ছেড়ে ধর্মের সেবাকে অবলম্বন করবে। যারা আরবী এবং ধর্মীয় জ্ঞানের পিপাসী হবে।" *(মলফুযাত ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা: ৬১৮, নতুন এডি)*

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ওয়াকফে জিন্দেগীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা পূরণের তৌফিক দান করুন। আমিন।

হে মুহাম্মদ (সা.) তোমার প্রেম ও ভালোবাসার টানে আমার দেহ তোমার পানে উড়ে যেতে চায়। হায় আমার যদি উড়ার শক্তি থাকতো!

-মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী,
প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)

ইসলামের প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গভীর অনুরাগ

মাওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

এই আয়াতে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনীর এমন এক চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে যার দৃষ্টান্ত অতুলনীয়। এই যুগে আখারীনদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা রসূলে পাক (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সন্তানদের মধ্য হতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে এই সৌভাগ্য প্রদান করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি (আ.) সম্পূর্ণরূপে রসূলে পাক (সা.)-এর রঙ্গে রঙ্গীন হয়েছেন এবং তাঁর (সা.)-এর প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়েছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইসলাম সেবার মাহাত্ম্য এই কথার মাধ্যমে ধারণা করা যেতে পারে যে, যখন তিনি (আ.) ১৮৮৯ ইং সনে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভিত্তি রাখেন তখন বয়াতের শর্তাবলীর মধ্যে এই শর্তও রাখেন যে, বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে এই অঙ্গীকার করবে যে, 'এখন হতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক হতে পবিত্র থাকবে।' *(তারীখে আহমদীয়াত, খন্ড : ১, পৃ: ৩৩৭)*

এক ব্যাথাতুর হৃদয়ের অবস্থা :

১৯ শতকের শেষের দিকে সমগ্র ভারতবর্ষে খৃষ্টানগণ চরম আধিপত্য বিরাজ করতে থাকে এবং সর্বত্র খৃষ্টানগণ তাদের তবলীগী প্রচারণা চালানো শুরু করে। মুসলমানরা সকল দিক হতে কোণঠাসা অবস্থায় ছিল। এই অবস্থা দেখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে যে ব্যাথার সৃষ্টি হয় এবং ইসলামের সেবার জন্য যে প্রেরণা জাগ্রত হয়, তা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই লেখার মাধ্যমে ধারণা করা যেতে পারে : তিনি (আ.) বলেন-'এ কথা কি সত্য নয় যে, কিছু সময়ের মধ্যেই এ দেশে প্রায় এক লাখ মানুষ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আর ছয় কোটি বা তার চেয়েও অধিক ইসলামবিরোধী পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা তাদের পবিত্র ধর্ম হারিয়েছে। এমনকি যারা নিজেদেরকে আলে-রাসূল বা রসূলের বংশ বলতো তারাও খৃষ্টানদের পোশাক পরিধান করে রসূলের শত্রুতে পরিণত হয়েছে এবং নবী করীম (সা.)-এর প্রতি আরোপিত এরূপ গালমন্দ ও অবমাননাকর এবং কুৎসা রটনা করে পুস্তক প্রকাশিত করেছে যা শুনে শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয় এবং হৃদয় কেঁদে কেঁদে এই সাক্ষ্য দেয় যে, যদি এরা আমাদের বাচ্চাদের আমাদের চোখের সামনে হত্যা করতো এবং আমাদের প্রাণ-প্রিয় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের টুকরো-টুকরো করে ফেলতো এবং আমাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিতভাবে হত্যা করতো ও আমার সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিত তাহলেও আল্লাহ্‌র কসম! আমার রাগ হতো না এবং এভাবে কখনো হৃদয় ব্যাথিত হতো না যেভাবে ব্যাথিত হয়েছে এসব গালি-গালাজ ও অপমান শুনে যা আমাদের রসূলে করীম (সা.)-কে করা হয়েছে।' *(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রুহানী খাযায়েন, খন্ড-৫, পৃ: ৫১-৫২)*

ইসলাম সেবার প্রেরণা সম্পর্কে সাক্ষ্য :

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এক বুযুর্গ সাহাবী হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের তবলীগ করার জন্য এরূপ উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, তিনি (আ.) বলতেন, মাঝে মাঝে আমার ভয় হয় যে, এই উৎকণ্ঠায় আমার মস্তিষ্ক না আবার ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়।' *[ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) রচিত হায়াতে আহমদ, খণ্ড: ১, পৃ: ১৫০]*

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলী বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একবার বলেন, 'ইসলামের অবস্থা ও খৃষ্টানদের আক্রমণ দেখে আমার মস্তিষ্কে এরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যে, মাঝে মাঝে আমার শংকা হয় যে, আমার মস্তিষ্ক ফেটে যাবে।' *(আল-হাকাম, পৃ: ৮, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩ ইং)*

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বড় ছেলে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের বর্ণনা হচ্ছে, 'শিরকের বিরুদ্ধে হযরত (আ.)-এর আবেগ এরূপ ছিল যে, সমস্ত পৃথিবীর আবেগ যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং হযরত (আ.)-এর আবেগ এক পাল্লায় রাখা হয় তবে তাঁর (আ.)-এর পাল্লাই ভারী হবে।' *(তারীখে আহমদ, খন্ড-১, পৃ: ১১৪-১১৫)*

এক হিন্দুর স্বীকারোক্তি :

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) তাঁর পুস্তক 'হায়াতে আহমদ'-এ লিখেন, 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং লালা মালাওয়ামাল সাহেবের সাক্ষাৎ ও সম্পর্কের মাধ্যমে যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় তা হল, ইসলামের প্রচার। সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ ও একান্তই পরিচিতিমূলক সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও তিনি (আ.) তবলীগ করা শুরু করে দেন। লালা মালাওয়াল সাহেব বর্ণনা করেন, আমি মনে করেছিলাম সম্ভবত মুসলমানদের নিকট ইশার নামাযের পূর্বে অন্য কারো কাছে ইসলামের প্রচার করা জরুরী বিষয়, কেননা মির্যা সাহেব নামাযের পূর্বে এ কাজ করাকে জরুরী মনে করেছেন।' *[ইয়াকূব আলী ইরফানী (রা.) কর্তৃক রচিত হায়াতে আহমদ, খণ্ড-১, পৃ: ১৪৯]*

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মধ্যে ইসলাম প্রচারের যে প্রেরণা কাজ করতো তা ১৮৮৫ সনে আরো অধিকহারে প্রকাশিত হয়, যখন তাঁর (আ.) এক প্রিয় সাহাবী লুধিয়ানা নিবাসী হযরত সূফী আহমদ জান সাহেব হজ্ব করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখন তিনি (আ.) এক হৃদয় বিদারক দোয়া লিখে দেন এবং বলেন, তাঁর পক্ষ থেকে যেন এই দোয়া খানা কা'বাতে এবং আরাফাতের ময়দানে তিনি বিশেষভাবে পাঠ করেন। সেই দোয়ার চিঠিতে তিনি (আ.) লিখেন, "ইয়া আরহামার রাহিমীন! যে কাজের প্রচারের জন্য তুমি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছ এবং যে খেদমতের জন্য তুমি আমার হৃদয়ে আবেগ তৈরী করেছ, তাকে তুমি নিজ অনুগ্রহে পূর্ণতা দাও এবং এই অধমের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের ও সে সমস্ত লোক যারা এখন পর্যন্ত ইসলামের বিশেষত্ব সম্পর্কে উদাসিন তাদের কাছে ইসলামের অকাট্য দলিল-প্রমাণাদি পূর্ণ কর।" *(তারীখে আহমদ, খণ্ড-১, পৃ: ২৬৫)*

ধর্মের সেবাকারীদের মূল্যায়ন :
হযরত মসীহ মওউদ (আ.) শুধু ইসলামের সেবাই করেন নি, বরং যারা ধর্মের সেবা করতো তাদেরকেও তিনি মূল্যায়ন করতেন। হযরত মাওলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.) বলেন, যদি কোন বন্ধু ইসলামের কোন সেবা করে, কোন কবিতা লিখে, ইসলামের পক্ষে কোন কবিতা লিখে নিয়ে আসে, তখন তিনি (আ.) তার অনেক মূল্যায়ন করতেন এবং অত্যন্ত খুশী হতেন। তিনি (আ.) বলতেন, যদি কেউ ধর্মের সাহায্যার্থে একটি শব্দও আমাকে বের করে দেয়, তবে তা আমার কাছে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণমুদ্রার থলের চেয়েও অধিক মূল্যবান মনে হয়। *(সীরাতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.), পৃ: ৫০)*

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এক বুযুর্গ সাহাবী হযরত পীর সিরাজুল হক নুমানী সাহেব (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সংস্পর্শে থাকার খুব ভাল সুযোগ লাভ করেছেন। ইসলামের সেবার প্রতি তিনি (আ.)-এর গভীর অনুরাগের কথা তিনি এভাবে বর্ণনা করেন যে, "তিনি (আ.) খুব কম ঘুমাতেন এবং কম শুতেন। আর দিনে ও রাতের অধিকাংশ সময় বিরূদ্ধবাদীদের বিভিন্ন আপত্তি খন্ডন, ইসলামের বিশেষত্ব এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর রিসালাতের সত্যতা, কুরআন মাজীদ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে হবার প্রমাণ এবং আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে লিখেই অতিবাহিত করতেন এবং এ থেকে যে সময় বেঁচে যেত তা দোয়ায় ব্যয় করতেন। তাঁর দোয়ার অবস্থা আমি এমন দেখেছি যে, এত অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে দোয়া করতেন যে, এতে তাঁর (আ.)-এর শারিরীক অবস্থা খারাপ হয়ে যেত।" *(তাযকিরাতুল মাহদী, প্রথম অংশ, পৃ: ১১)*

ইসলামের প্রতি গভীর অনুরাগের কতিপয় দৃষ্টান্ত: প্রাথমিক যুগের কথা, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই খবর জানতে পারলেন যে, বাটালার কুদরতউল্লাহ নামক এক মৌলভী ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে গেছে। এ খবর শুনে তিনি অত্যন্ত ব্যাথিত হন। তিনি (আ.) মুন্সী নবী বখ্‌শ সাহেব, যিনি এ সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, তাকে বলেন, অত্যন্ত হিকমতের সাথে চেষ্টা করুন যেন কোনভাবে মৌলভী সাহেব ইসলামে ফেরত আসেন। তিনি (আ.) আরো বলেন, যদি আমার যাবার প্রয়োজন হয় তবে আমি স্বয়ং যেতে প্রস্তুত আছি। তিনি (আ.) মুন্সী নবী বখ্‌শ সাহেবকে বলেন, এক্ষেত্রে পূর্ণ চেষ্টা করুন। আমি দোয়া করবো। পরিণাম এটাই হয়েছে যে, অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে মৌলভী কুদরত উল্লাহ সাহেব পুনরায় ইসলামে ফেরত আসেন। আর এতে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) অত্যন্ত খুশী হন। *(তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-১, পৃ: ১১৪)*

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ কপুরথলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, লুধিয়ানার ঘটনা। একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এমন মাথা ব্যাথা শুরু হয় যার ফলে তাঁর (আ.)-এর হাত-পা একেবারে বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায়। আমি হাত দিয়ে দেখি যে, শিরার স্পন্দন খুব কম হয়ে গেছে। তিনি (আ.) আমাকে বলেন, 'ইসলামের প্রতি যদি কোন আপত্তি স্মরণে থাকে তবে আমাকে বল, তাহলে এর উত্তর দিতে গিয়ে আমার শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠবে এবং এই ব্যাথা কমে যাবে'। আমি বললাম, হুযুর, এই মুহূর্তে কোন আপত্তির কথা আমার স্মরণে আসছে না। এরপর বলেন, আঁ-হযরত (সা.)-এর না'ত হতে যদি কিছু স্মরণে থাকে তবে তা পড়। আমি 'বারাহীনে আহমদীয়ার' নযম 'এ্যায় খোদা! এ্যায় চারাহে আযারিমা' সুললিত কণ্ঠে পড়া শুরু করে দিই, যা শুনে তাঁর (আ.)-এর শরীর উত্তপ্ত হতে থাকে। অত:পর তিনি (আ.) শুয়ে শুয়ে তা শুনতে থাকেন। এরপর একটি আপত্তির কথা আমার স্মরণে আসে। যখন আমি তাঁকে এই আপত্তি শুনাই তখন হুযুর (আ.) অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং তৎক্ষণাত বসে পড়েন এবং অত্যন্ত জোড়ালো বক্তব্য প্রদান করেন। ইতোমধ্যে অনেক লোকও এসে যায় আর তাঁর (আ.)-এর ব্যাথাও দূর হয়ে যায়। *(সীরাতুল মাহদী, খণ্ড-৪, পৃ: ৩৮-৩৯)*

ধর্মের সেবায় নিজের সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত:
হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের সেবা প্রাথমিক যুগ থেকেই শুরু করে দিয়েছিলেন। পত্র-পত্রিকায় তিনি (আ.) ইসলাম, কুরআন মজীদ ও রসূলে পাক (সা.)-এর বিরুদ্ধে প্রকাশিত আপত্তির উত্তর প্রবন্ধ আকারে প্রদান করতেন। যখন তিনি (আ.) দেখতে পেলেন যে, বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে তখন তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য-সমর্থনে এক অবিসংবাদিত পুস্তক 'বারাহীনে আহমদীয়া' লেখা শুরু করেন। এটি এমনই এক মহান পুস্তক যার জবাব দিতে ইসলামের শত্রুরা অদ্যবধি সমর্থ হয় নি। শুধু তা-ই নয়, তিনি (আ.) তাদেরকে এই চ্যালেঞ্জও প্রদান করেন যে, "যদি তারা ইসলামের বর্ণনাকৃত বিশেষত্বের বিপরীতে সে সমস্ত বৈশিষ্ট্যই নিজেদের ধর্মে দেখিয়ে দেয় অথবা এর অর্ধেকাংশ অথবা এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশ প্রমাণ করে দেয় অথবা কমপক্ষে আমাদের উপস্থাপিত দলিল-প্রমাণাদিকে খন্ডন করে দেখায়, তবে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি

যার মূল্য প্রায় দশ হাজার রূপী, সেই ব্যক্তিকে পুরষ্কার স্বরূপ দিতে প্রস্তুত।" এটি কোন সাধারণ বিষয় নয়। এর মাধ্যমে তাঁর নিজের সত্যতা ও বর্ণনাকৃত দলিল-প্রমাণাদির উপর পূর্ণ বিশ্বাস প্রকাশিত হয়। অপর দিকে ইসলামের সেবা করার প্রতি তাঁর (আ.)-এর গভীর অনুরাগের বিষয়টিও প্রস্ফুটিত হয়। ইসলামের মর্যাদাকে সমুন্নত করার জন্য তিনি (আ.) তাঁর সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ তোমরা দেখেছ যে, খোদার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করা আমি আমার জীবনের আসল উদ্দেশ্য জ্ঞান করি। অত:পর তোমরা নিজেদের হৃদয়ে দেখ যে, তোমাদের মধ্যে কয়জন এমন আছে, যে নিজের জন্য উক্ত কাজকে পছন্দ করে এবং খোদার জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে প্রিয় জ্ঞান করে। *(মালফুযাত, খণ্ড-২, পৃ: ১০০)*

ইসলামের বিজয়ের আকাঙ্খা :

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ের সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা এটাই ছিল যে, সারা পৃথিবীতে ইসলাম বিজয় লাভ করবে। এই আবেগের কথা আমরা হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)-এর একটি বর্ণনা হতে ধারণা করতে পারি। যেখানে তিনি (রা.) বলেন, "একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পাশে এক কামরায় তিনি বসে ছিলেন। হুযুর (আ.) একটি পুস্তক রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। দরজায় কেউ খুব জোড়ে কড়া নাড়ে। তিনি (আ.) আমাকে বলেন, আমি যেন গিয়ে দেখি কে এসেছে এবং কি জন্য এসেছে। আমি দরজা খোলার পর লোকটি বলে, মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ আহসান সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন যেন হুযুর (আ.)-এর নিকট এই সুসংবাদ পৌঁছানো হয় যে, আজ অমুক শহরে এক অ-আহমদী মৌলভীর সাথে তার বাহাস হয়েছে এবং সে তাকে পরাজিত করেছে। হযরত মুফতি সাহেব বলেন, যখন এই সমস্ত কথা আমি হুযুরের কাছে উপস্থাপন করি তখন হুযুর (আ.) তা শুনে মুচকি হাসেন এবং বলেন, তার এভাবে জোড়ে জোড়ে কড়া নাড়া এবং বিজয়ের কথা ঘোষণা করা হতে আমি মনে করেছিলাম সম্ভবত সে এ খবর নিয়ে এসেছে যে, ইউরোপ মুসলমান হয়ে গেছে। *(সীরাতুল মাহদী, প্রথম অংশ, পৃ: ২৮৯-২৯০)*

ইসলামের সেবায় কষ্ট সহ্য করা :

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক পুলিশ অফিসার হঠাৎ করেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ঘরের তল্লাশি নিতে চলে আসে। হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব যখন এ কথা জানতে পারলেন, তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসেন এবং মসীহ মওউদ (আ.)-কে বলেন, পুলিশ অফিসার গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হাতকড়া হাতে নিয়ে আসছেন। হযরত সাহেব তখন 'নুরুল কুরআন' পুস্তক লিখছিলেন। তিনি (আ.) মুচকি হাসি হেসে মাথা তুলে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে বলেন, মীর সাহেব! লোকজন দুনিয়াবী খুশীতে সোনা-রূপার চুড়ি পড়ে থাকে। আমি এটি মনে করবো যে, আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় লোহার চুড়ি পরিধান করেছি।

একই সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বলেন, কিন্তু এমনটা হবে না। কেননা খোদার রাজত্বের নিজস্ব আইন-কানুন থাকে। তিনি তাঁর প্রত্যাদিষ্ট খলীফাদের লাঞ্ছিত হওয়া পছন্দ করেন না। *(মালফুযাত, খণ্ড: ১, পৃ: ৩০৫-৩০৬)*

বিরোধীতা সত্তেও চরম দৃঢ়তা :

এ বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চরম বিরোধীদের কতিপয় স্বীকারোক্তি: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুতে এক আর্য পত্রিকার সম্পাদক লিখেন, "মির্যা সাহব তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিজ উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং শত বিরোধীতা সত্তেও সামান্যতম পদস্খলিত হন নি।

অনুরূপভাবে, এক খৃষ্টান লেখক এইচ. এ. ওয়াল্টার লিখেন, "মির্যা সাহেব যে সাহসিকতা তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের চরম বিরোধীতা ও নিপীড়নের মোকাবেলায় দেখিয়েছেন তা প্রকৃত অর্থেই প্রশংসার দাবী রাখে। (ইংরেজী পত্রিকা 'আহমদী মুভমেন্ট')

অসুস্থ্য অবস্থাতেও কলমের জিহাদ :

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর সমস্ত জীবন ইসলামের সেবায় অতিবাহিত করেছেন। জীবনের শুরু থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি (আ.) কলমের জিহাদ করে গেছেন। তিনি (আ.) যে প্রবন্ধই লিখতেন তা স্বয়ং কাতেবের (লেখকের) কাছে নিয়ে যেতেন এবং নিজেই তা সংশোধন করতেন। তিনি (আ.) স্বয়ং প্রেসে গিয়ে তা ছাপাতেন। এ সব কিছু তাঁর (আ.)-এর ইসলামের প্রতি সুগভীর ভালবাসারই বহি:প্রকাশ ছিল।

একটু কল্পনা করুন! আল্লাহ্ তা'লার এক প্রত্যাদিষ্ট বুযুর্গ ঘরের আঙ্গিনায় ইসলামের প্রতিরক্ষাকল্পে পুস্তক লেখায় ব্যস্ত। একটি দোয়াত ঘরের একদিকের তাকে, অপরটি আরেকদিকে। কাগজ হাতে নিয়ে চলতে চলতে প্রবন্ধ লিখছেন। কলমের কালি কম হয়ে গেলে দোয়াতে কলম ডুবিয়ে নিচ্ছেন। প্রচন্ড গরম ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও এই জিহাদ জারী আছে। সুস্থ্য ও অসুস্থ্য সকল অবস্থায় একই কাজ করে যাচ্ছেন।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর লেখনীর বেশ কিছু অংশই অসুস্থ্য অবস্থায় লিখেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর সর্বশেষ পুস্তক 'পয়গামে সুলেহ' মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে ২৫ মে, ১৯০৮ ইং সনে সন্ধ্যায় লিখে শেষ করেন, যখন কিনা তিনি (আ.) অসুস্থ ছিলেন। শরীর অত্যন্ত দূর্বল ছিল, কিন্তু তিনি (আ.) এই অবস্থাতেই যতটুকু সম্ভব লেখা সম্পন্ন করে কাতেবের হাতে সোপর্দ করেন। এরপর নিজ প্রিয় প্রভুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনের অন্তিম মুহুর্তের এই ঘটনাই সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমস্ত জীবন ইসলামের প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালবাসায় পূর্ণ ছিল এবং তিনি (আ.) তাঁর সমস্ত জীবন ইসলামের সেবাতেই অতিবাহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর (আ.) আদর্শ ও শিক্ষার পরিপূর্ণ অনুসরনের তৌফিক দান করুন। (আমিন)

আপন শিষ্যদের সাথে হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর দয়া ও সহমর্মিতার আচরণ

মাওলানা রশিদ আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আল্লাহ্ তা'লার নবী-রসূল প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা। আর সেই দয়া-মায়া ও সহমর্মিতার ধরণ এমন হয়ে থাকে যে, তাঁরা অর্থাৎ নবী-রসূলগণ এর জন্য নিজ জীবন বিলীয়ে দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। সেই দয়া-মায়ার প্রথম ও শেষ স্তর হলো খোদা তা'লার বান্দারা যেন খোদা তা'লার সত্যিকার ইবাদতগুজার বান্দায় পরিণত হয়। কারণ, এর মাঝেই বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সফলতা নিহিত। আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই দয়া ও সহমর্মিতার প্রতি ইশারা করে কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ- তারা মুমিন হচ্ছে না বলে তুমি কি নিজ প্রাণ বিনাশ করে ফেলবে? *(সূরা শোআরা: ৪)*

লোকদের প্রতি কোমলচিত্ততা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারই ফল হয়ে থাকে। আর নবী-রসূলগণ কোমলচিত্ত হওয়ার কারণে লোকেরা তাদের আশেপাশে একত্রিত হয়। তাঁরা কঠোর ও রুক্ষ হলে তাদের প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হতো না। আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়ের প্রতি রসূল করীম (সা.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সূরা আলে ইমরানের ১৬০ নং আয়াতে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

অর্থাৎ আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরম কৃপার কারণে তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছ। আর তুমি যদি রুক্ষ ও কঠোরচিত্ত হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়তো।

আল্লাহ্‌র প্রেরিত সকল মহাপুরুষের ন্যায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আ.) নানান গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর (আ.) শিষ্য হযরত ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চারিত্রিক গুণাবলী বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি তাঁর (আ.) নানান গুণের কথা এভাবে উল্লেখ করেন:

"হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিতান্তই মমতাময় ও দয়ালু ছিলেন, দানশীল ছিলেন, অতিথি আপ্যায়নকারী ছিলেন, সর্বোচ্চ সাহসী ছিলেন। পরীক্ষার সময় যখন লোকেরা হতাশ-নিরাশ হয়ে যেতো, তিনি বাঘের ন্যায় অগ্রসর হতেন। ক্ষমা করা, চোখ অবনত রাখা, উদারতা, বিনয়, বিশ্বস্ততা, সরলতা, প্রভুভক্তি, রসুলপ্রেম, ধর্মের সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, উত্তম সামাজিক আচরণ, মর্যাদাবান, আত্মাভিমানী, সাহসী, দৃঢ়চেতা, উত্তম আচরণের অধিকারী এবং ভাগ্যবান –এসব তাঁর সর্বোত্তম গুণাবলীর মাঝে অন্তর্ভুক্ত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে আমি ঠিক সে সময় দেখেছি যখন আমার বয়স কেবল দু'বছর। এরপর তিনি আমার চোখ থেকে সেদিন অদৃশ্য হয়েছেন, যখন আমি ২৭ বছরের টগবগে যুবক। কিন্তু আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমি তাঁর চেয়ে উত্তম, তাঁর চেয়ে উত্তম চারিত্রিক-গুণাবলীর আধিকারী, তাঁর চেয়ে অধিক পুণ্যবান, তাঁর চেয়ে অধিক মমতাময়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রেমে তাঁর চেয়ে অধিক বিভোর কোন ব্যক্তিকে দেখি নি। তিনি এমন এক নূর ছিলেন, যিনি মানবজাতির কল্যাণে এ জগতে প্রকাশিত হয়েছিলেন, আর দয়ার এক বৃষ্টি ছিলেন, যা দীর্ঘকাল এ জগতের শুষ্ক ঈমানের ভূমিতে বর্ষিত হয়েছে এবং এ ঈমানের জমিনকে সবুজ-শ্যামলে রূপান্তরিত করে গেছেন।" *(সিরাতুল মাহদী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯৭৫ নং রেওয়ায়েত, পৃ. ৮২৪-৮২৭)*

আল্লাহ্‌র প্রেরিত সকল মহা পুরুষের ন্যায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর হৃদয় ছিল দয়া-মায়ায় পরিপূর্ণ এবং স্বভাব ছিল নরম ও কোমল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দয়া-মায়া ও সহমর্মিতার আকর ছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র জীবনে নিজ জামাতের সদস্যদের জন্য দয়া-মায়া ও সমবেদনা আর তাদের প্রতি ভালোবাসার অগণিত হৃদয়গ্রাহী এবং ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা পাওয়া যায়। নিজ শিষ্য ও সেবকদের প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কতটা দয়ালু ও মমতাময় ছিলেন আর কীভাবে তাদের দু:খ-কষ্টের খবর পাওয়া

মাত্র অস্থির ও বিচলিত হতেন আর নিজে বিগলিত চিত্তে কান্নাকাটি করে দোয়া করতেন এবং প্রজ্ঞার সাথে চেষ্টা প্রচেষ্টা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন, এমন শত শত ঘটনা পাওয়া যায়। এখানে কেবল কয়েকটি উল্লেখ করা সম্ভব হবে।

হযরত মুফতি ফযলুর রহমান সাহেব ভেরভী (রা.) বলেন: ১৮৯৮ সালে আমার জ্বর হয়। পনেরতম দিনে এশার সময় হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব দেখতে এলেন। সে মুহূর্তে আমি প্রচন্ড জ্বরে প্রলাপ বকছিলাম। বাড়ী থেকে বের হয়ে তিনি মৌলভী কুতবুদ্দীন সাহেবকে বললেন যে, আজ তার অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন, বিপদ আসন্ন মনে হচ্ছে। পর্দার পেছন থেকে আমার স্ত্রী শুনছিল। সেই মুহূর্তেই সে হযরত সাহেবের কাছে দৌড়ে গেল এবং নিবেদন করে বলল, আপনি কিছু একটা করুন, ফযলুর রহমান সাহেবের অবস্থা সংকটাপন্ন। তখন তিনি কোন পুস্তক লেখার কাজে নিমগ্ন ছিলেন। আমার স্ত্রীর কথা শুনে বললেন, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লিখছি, আমি মৌলভী সাহেব (হযরত হাকীম মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব)-কে বলে দিয়েছি, তিনি যেন খুব মনোযোগ দিয়ে চিকিৎসা করেন। তিনি বললেন, মৌলভী সাহেব আজ প্রায় নিরাশা ব্যক্ত করে বিদায় নিয়েছেন। এখন মনিবের কথা শুনুন যে, ভৃত্যের জন্য তিনি কতটা ব্যাকুল হলেন! উল্লিখিত হযরত মুফতি সাহেব বলেন, এ কথা শুনে হযরত সাহেব সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লেখা স্থগিত করলেন এবং বললেন, 'তার কাছ থেকে আমার এখনো অনেক কাজ নেয়া বাকি আছে। তুমি যাও, আমি এখনি তার জন্য দোয়া করছি।' অতএব তিনি ঘরে চলে আসলেন। রাত বারোটার সময় আমার একবার রক্ত আমাশয় হলো। এরপর দ্বিতীয়বারও হলো, অতঃপর আমার চোখ খুলে গেল। এরপর তৃতীয়বার রক্ত আমাশয় হলো। সকালে মাষ্টার আব্দুর রহমান জলন্ধরি আমার কাছে আসলেন আর বললেন, ফজরের নামাযের পর হযরত সাহেব মৌলভী আব্দুল করিম শিয়ালকোটি সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'রাতে যখন আমি জানতে পেরেছি যে, ফযলুর রহমানের অবস্থা সংকটাপন্ন। তখন দোয়ার দিকে আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হলো আর আমি বারোটা পর্যন্ত সিজদায় থাকলাম। আমাকে বলা হলো "আরোগ্য লাভ হয়েছে।" আমি জানি না এর কী অর্থ? কে যাবে আর খবর নিয়ে আসবে।' তাই আমি নিজে এসেছি। তিনি বলেন, আমার মাঝে কথা বলার শক্তি ছিল না। কিন্তু ইশারায় বললাম, বারোটা থেকে উপশম হতে শুরু করেছে।

হযরত মুফতি ফযলুর রহমান সাহেবেরই বর্ণনাকৃত আরেকটি ঘটনা: যা পূর্বের ঘটনার চেয়ে আরও বেশি ঈমান-উদ্দীপক। এটি সেসময়ের ঘটনা, যখন তাঁর (রা.) ঔরসে পুত্র আব্দুল হাফিজের জন্ম হয়। শীতকাল ছিল আর তখন প্রসূতি মহিলারা খিঁচুনি রোগে মারা যাচ্ছিল। তিনি বলেন: "আমার স্ত্রীর সন্তান জন্মদানের সপ্তম দিন মাগরিব নামাযের কাছাকাছি সময়ে সেই রোগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। সে দিনগুলোতে এটি মহামারী আকারে চলছিল তাই তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। মাগরিব নামাযের পর আমি হযরত সাহেবের কাছে দৌড়ে গেলাম এবং তাঁকে ঘটনা খুলে বললাম। তিনি (আ.) বললেন, এ তো অতি ভয়ংকর রোগের পূর্ব লক্ষণ, তুমি তাকে এক্ষণি দশ রতি হিংগ (এক প্রকার ঔষধ) খাওয়াও আর এক-দেড় ঘন্টা পর আমাকে খবর জানাও। এশার নামাযের পর আমি পুনরায় উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম যে, রোগ বেড়ে চলেছে। তিনি বললেন, দশ রতি কুইনাইন খাইয়ে দাও এবং এক ঘন্টা পরে আমাকে জানাও।

হুজুরের নিজ শিষ্যদের জন্য দয়ামায়া, মমতা দেখুন। হযরত মুফতি সাহেব বলেন যে, হুজুর সাথে সাথে এও বললেন, মনে করো না যে, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, নির্দ্বিধায় চলে আসবে এবং সিঁড়িতে জোরে জোরে আওয়াজও করবে। মুফতি সাহেব বলেন: "এক ঘণ্টা পর আমি পুনরায় গেলাম এবং জানালাম যে, কোন উন্নতি হয় নি। তিনি বললেন, দশ রতি কস্তুরি খাইয়ে দাও। আমি বললাম, এ মুহূর্তে কস্তুরি কোথায় পাবো? হুজুর (আ.) নিজে কস্তুরি নিয়ে এলেন এবং বললেন, এখানে দশ রতি কস্তুরি হবে। আমি বললাম, হুজুর এখানে অনেক বেশি আছে। তিনি বললেন, নিয়ে যাও, পরে কখনো কাজে লাগবে। আমি তা নিয়ে গেলাম এবং দশ রতি কস্তুরি রোগীকে খাইয়ে দিলাম। এক ঘন্টা পরে পুনরায় হুজুরের কাছে গেলাম এবং বললাম অসুস্থতা আরও বেড়ে গেছে। তিনি বললেন, দশ তোলা ক্যাসট্রোয়েল দিয়ে দাও। আমি এসে দশ তোলা ক্যাসট্রোয়েল দিলাম। এরপর তার প্রচণ্ড বমি হলো। বমিই হলো এই রোগের সর্বশেষ অবস্থা। বমির পর তার নিঃশ্বাস আটকে গেল, মাথা পেছনের দিকে কষে গেল, চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো এবং কথা বন্ধ হয়ে গেল।" বাহ্যিক এই অবস্থা নিরাশারই ছিল, যেগুলো দেখে মানুষ বুঝে ফেলে, এখন খোদার নির্ধারিত আদেশে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এদিকে খোদার প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির দাসের নিজ মনিবের দোয়ার প্রতি এমনই ভরসা ছিল যে, তিনি বলতে লাগলেন, আমি দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। হুজুর আমার পায়ের শব্দ শুনে দরজা খুলে দিলেন এবং বললেন, কী অবস্থা, সব ঠিক আছে তো? তিনি সমস্ত ঘটনা জানালেন। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি (আ.) বললেন আর কতই না চমৎকারভাবে বললেন: "জাগতিক যত অস্ত্র ছিল, আমরা সবটা ব্যবহার করেছি। এখন একটি মাত্র অস্ত্র

অবশিষ্ট আছে, আর তা হলো দোয়ার অস্ত্র। তুমি যাও, আমি দোয়া থেকে তখনই মাথা তুলব যখন জানব যে, সে সুস্থ হয়েছে।"

হযরত মুফতি সাহেব বলেন, রাত তখন দুইটা বেজে গেছে। আমি এ কথা শুনে ফেরত চলে এলাম আর স্ত্রীকে এ কথা বলে যে, এখন ঠিকাদার তার ঠিকা স্বয়ং নিয়েছেন। দ্বিতীয় কামরায় গিয়ে খাটে শুয়ে পড়লাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ডেক-ডেকচির আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙলো। দেখলাম, আমার স্ত্রী থালাবাটি বা ডেকডেকচি ধোয়ামাজা করছে। আমি তার শারিরীক অবস্থা জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলল, আপনি তো গিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন, এর ঠিক দু'ঘন্টা পর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সুস্থ্য করে দিয়েছেন। *[সীরাতে আহমদ, লেখক–মৌলভী কুদরতুল্লাহ সানওয়ারী (রা.), পৃ. ১৭১-১৭২]*

এ ঘটনাবলী দ্বারা জামাতের সদস্যদের প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দয়ামায়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'লার সত্ত্বার প্রতি তাঁর ভরসা, দোয়ার প্রতি আস্থা আর খোদা তা'লার কুদরতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্পষ্টত লক্ষণীয়। আর আমাদের জন্যও এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, আমাদেরও এমন ঈমান এবং বিশ্বাস অর্জন করার আর এমনি ভালোবাসা আর সহানুভুতি নিজ মোমেন ভাইদের জন্য নিজেদের হৃদয়ে সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিৎ।

সহায় সম্বলহীন এক ছেলের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ প্রদর্শন: আব্দুল করীম নামক এক ছেলে শিক্ষা অর্জনের জন্য কাদিয়ান আসে। ঘটনাচক্রে তাকে এক পাগল কুকুর কামড় দেয়। চিকিৎসার জন্য তাকে কসূলী প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে সে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ্য হয়ে কাদিয়ান ফিরে আসে। এর কিছু দিন পর তার জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে সেই অসহায় ছেলের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করা হলে তিনি (আ.) ভীষণ ব্যাথিত হন। কসূলীতে টেলিগ্রাম মারফত সেই ছেলের চিকিৎসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে জানানো হয়, এর কোন চিকিৎসা নাই। এটি শুনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই দুস্থ, অসহায়, ঠিকানাহীন ছেলের জন্য এতটা অস্থির ও বিচলিত হলেন যে, নিকটাত্মীয়রাও এতটা বিচলিত ও অস্থির হয় না। কিছুক্ষণ পর পর তিনি (আ.) সেই ছেলের খবর নিতে থাকেন আর নিজ হাতে ঔষধ তৈরী করে প্রেরণ করতে থাকেন। আপন শিষ্যের জন্য মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই অস্থির চিত্তে দোয়া ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিদর্শনমূলক আরোগ্য দান করেন। (সীরাতে হযরত মসীহ মওউদ, পৃষ্ঠা ২৯১-২৯২, লেখক-ইয়াকুব আলী ইরফানী, সংক্ষেপিত)

হযরত শেখ জয়নুল আবেদিন সাহেব বর্ণনা করেন: আমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব রোগ ছিল এবং চার ছেলে মারা গিয়েছিল, চিকিৎসায় ভালো হতো না। আমি হযরত সাহেবের কাছে উপস্থিত হলাম। হুজুর বললেন, মিয়া জয়নুল আবেদিন! তুমি এতদিন আমাকে কেন জানাও নি? তোমরা স্বামী-স্ত্রী তো চার বছর জাহান্নামে পড়ে ছিলে। আমাকে তৎক্ষনাৎ জানানো উচিৎ ছিল। এরপর বললেন, মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেবের কাছে চিকিৎসা করাও, রোগ ইনশাআল্লাহ্ ভালো হয়ে যাবে। আমি আরয করলাম, হুজুর আমার অতটা সামর্থ্য নেই, আমি হতদরিদ্র, মৌলভী সাহেবের কাছে চিকিৎসা করাতে পারবো না। বললেন, তুমি কি চাও আমি চিকিৎসা করি? সে বলল, না। হুজুর বললেন, তাহলে কী চাও? বলল, হুজুর দোয়া করুন। হযরত সাহেব দরজাতেই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাত উঠিয়ে দোয়া করা শুরু করলেন। তিনি (আ.) বললেন, আপনিও দোয়া করুন, আমিও দোয়া করছি। যোহরের নামাযের পর থেকে আসরের আযান পর্যন্ত হুজুর দোয়া করলেন আর যতক্ষণ দোয়া করেছেন, ততক্ষণ কান্নাকাটি করেছেন। অশ্রু হুজুরের পবিত্র দাড়ি বেয়ে টপ টপ করে নিচের চৌকাঠে পড়তে লাগলো। আমি ক্লান্ত হয়ে দেয়ালে ঠেক দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম, হুজুরকে কেন আমি এতটা কষ্ট দিতে গেলাম? সন্তান না হলে না হতো, কিন্তু হুজুরকে এতটা কষ্ট দেয়া আমার উচিৎ হয় নি। যাহোক, হুজুর দোয়া শেষ করলেন আর বললেন, তোমার দোয়া কবুল হয়ে গেছে এবং হাটকুড়ো রোগ দূরীভুত হয়ে গেছে। এবারকার গর্ভধারণে তোমার পুত্র লাভ হবে। তোমার পুত্র ও স্ত্রীর চেহারা আমাকে দেখানো হয়েছে। তুমি কোন চিন্তা করো না। এরপর তিনি (আ.) বললেন, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন, বন্ধ্যাত্ব রোগ আর কখনোই হবে না। এখন কি আমার ভিতরে প্রবেশের অনুমতি আছে? . . দু'চার বছর পর হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন, মিয়া জয়নুল আবেদিন সাহেব! সন্তান কি হয়েছে? আমি বললাম, হুজুর! এখন তো সন্তান হচ্ছে আর এ তো হুজুরের দোয়ার ফল। হুজুর বললেন, আমি আবার কবে দোয়া করলাম? আমার তো মনে নেই। তখন আমি হুজুরকে স্মরণ করালাম। খোদা তা'লার কৃপায় দোয়ার পর আজ পর্যন্ত আমার কোন সন্তান মারা যায় নি, এখন আমার চার ছেলে এবং তিন মেয়ে জীবিত আছে। *(রেজিষ্টার রেওয়ায়েতে সাহাবা, একাদশ খণ্ড)*

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন: মুসাম্মাৎ আমাতুল্লাহ বিবি, যিনি কাবুলের খোস্ত এলাকার অধিবাসী, তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, শুরুর দিকে যখন তিনি তার পিতা এবং চাচা যথাক্রমে সাইয়্যেদ নূর সাহেব এবং সাইয়্যেদ আহমদ নূরের সাথে কাদিয়ান আসেন, তখন তার

বয়স খুব কম ছিল আর তার পিতা-মাতা এবং চাচা-চাচী হযরত সাইয়্যেদ আব্দুল লতিফ সাহেব শহীদ (রা.)-এর শাহাদাতের পর কাদিয়ান চলে আসেন। শৈশবে মোসাম্মৎ আমাতুল্লাহর চোখে প্রচণ্ড গোলযোগ দেখা দিত আর চোখের কষ্ট এতটাই বেড়ে যেত যে, প্রচণ্ড ব্যাথা এবং চোখ লাল হয়ে যাওয়ার জন্য চোখ খোলার শক্তিটুকু তিনি পেতেন না। তার পিতা-মাতা তার অনেক চিকিৎসা করিয়েছিলেন কিন্তু কোন লাভ হয় নি, বরং কষ্ট বৃদ্ধিই পেয়েছে। একদিন তার মাতা যখন তাকে ধরে চোখের ভিতর ঔষধ ঢেলে দিতে লাগলেন, তখন তিনি ভয়ে এ কথা বলতে বলতে পালিয়ে গেলেন যে, আমি হযরত সাহেবের কাছে দম করাব। তিনি বর্ণনা করেন, আমি দৌড়িয়ে হযরত সাহেবের ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম আর কাঁদতে কাঁদতে হুজুরের সামনে নিবেদন করলাম, আমার চোখে ভীষণ কষ্ট আর ব্যাথা ও লাল হবার দরুণ আমি খুব অস্থির হয়ে পড়ি আর চোখ খুলতে পারি না। আপনি আমার চোখে দম করে দিন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দেখলেন, সত্যিই আমার চোখ ভয়ংকর ভাবে লাল হয়ে ছিল আর আমি ব্যাথায় কাতরাচ্ছিলাম। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মুখ থেকে আঙুলে সামান্য লালা নিলেন আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে (সম্ভবত হুজুর মনে মনে দোয়া করছিলেন) খুব আদরের সাথে, মমতার সাথে নিজ আঙুল আমার চোখের উপর ধীরে ধীরে বুলিয়ে দিলেন আর আমার মাথায় হাত রেখেন বললেন: "মামনি যাও, খোদার দয়ায় আর কখনো তোমার চোখের এ কষ্ট হবে না"। মুসাম্মাৎ আমাতুল্লাহ বর্ণনা করেন, এর পর থেকে আজ পর্যন্ত (বর্তমানে আমি সত্তর বছরের বৃদ্ধা) কখনো একবারের জন্যও আমার চোখে ব্যাথা হয় নি আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর দমের বরকতে আমি চিরদিনের জন্য একেবারেই সুরক্ষিত রয়েছি, অথচ ইতিপূর্বে অধিকাংশ সময় আমার চোখ ব্যাথা করতো আর আমি অনেক কষ্ট সহ্য করতাম। তিনি আরও বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন আমার চোখের উপর তাঁর মুখের লালা নিয়ে আরাম করে বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। মোটকথা, বিগত ষাট বছরের এই সুদীর্ঘ সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই আধ্যাত্মিক তাবিজ সেই কাজ করে দেখিয়েছে, যা আজ পর্যন্ত কোন ঔষধ করে দেখাতে পারবে না।

হযরত সাহেবযাদা মীর্যা বশির আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, বন্ধুদের স্মরণ রাখা উচিত, দম করার পদ্ধতি মূলত দোয়ারই একটি ধরন। তিনি আরো বলেন, দম পদ্ধতি বিষয়ে এ বিষয়টিও উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং বন্ধুদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, আসলে এ চিকিৎসা-পদ্ধতি হুজুর পাক (সা.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কোন কোন সময়ের কর্ম দ্বারা প্রতীয়মাণ। কিন্তু এটি অধিকহারে ব্যবহার করা এমনকি তন্ত্র-মন্ত্র বানিয়ে নেয়া কোন মতেই সমীচীন নয়। কেননা, অসাবধানতার পরিণামে এর মাধ্যমে অনেক বিদ'আতের পথ খুলে যেতে পারে। উত্তম হলো, যেভাবে পবিত্র কুরআন বলে, দোয়ার বৈধ পদ্ধতি গ্রহন করা হোক আর কখনো যদি চিকিৎসার জন্য দম করার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে কোন পুন্যবান, খোদাভীরু এবং আধ্যাত্মিক বুযুর্গের দ্বারা দম করানো যেতে পারে, অন্যথায় যেভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন সেটিই হতে পারে তথা কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের পথ খুলে যেতে পারে।

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের প্রতি অগাধ ভালোবাসার ধরণঃ হযরত আব্দুল করীম সাহেব ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার কাঁধে একটি ফোঁড়া হয়। যা অপসারণের জন্য কয়েক দফা অপারেশন করার প্রয়োজন হয়। বেশখানিকটা ক্লোরোফরম ব্যবহার করা এবং প্রচুর রক্ত ক্ষরণের ফলে তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

হযরত ডাক্তার মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব বলেন, হযরত মৌলভী সাহেবের এই অবস্থা সম্পর্কে আমি অবগত হয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে যে বেদনা অনুভব করতে দেখেছি তা কোন পিতা-মাতা তাদের প্রিয় সন্তানের জন্য যে কষ্ট ও বেদনা অনুভব করে তার চেয়ে কম ছিল না বরং এই মসীহকে তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানের জন্য এর চেয়ে বেশি কষ্ট পেতে দেখেছি। তারপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন। কিছু কস্তুরী (মৃগনাভী) নিয়ে এসে বলেন, মৌলভী সাহেবকে দিন। তারপর তিনি দোয়ায় রত হয়ে যান।

ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মৌলভী সাহেবের অপারেশনের পর থেকে রাতের বেলা ঘুমানোকে নিজের জন্য এক প্রকার হারামই করে ফেলেন। তিনি (আ.) মাথা ব্যথ্যায় আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু এই কোমল হৃদয়ের অধিকারী সারা রাত দয়ালু প্রভূ-প্রতিপালকের সমীপে মৌলভী সাহেবের জন্য দোয়ায় লেগে থাকতেন। এই দয়া-মায়া ও আত্মত্যাগ কোন সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি কেবল আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত এবং প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যিনি নিজ কষ্টকে অন্যের খাতিরে ভুলে যাবেন, এমনকি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবেন। হযরত আকদাস (আ.) রাতের মধ্যভাগ থেকে ঊষার উদয় পর্যন্ত দোয়ায় রত থাকতেন এবং মৌলভী সাহেবের বাড়ির দরজায় এসে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। সমস্ত দুনিয়া ঘুমিয়ে থাকত কিন্তু খোদা তা'লার এই সিংহ জাগ্রত থাকতেন; নিজের জন্য নয়, নিজ সন্তানের জন্য নয়, নিজ স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যেও নয়

কেবল দয়ালু ও কৃপালু খোদার সমীপে নিজ শিষ্যের আরোগ্যের জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্যে।

অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, তিনি (আ.) কয়েক রাত না ঘুমিয়ে কাটান। ফলশ্রুতিতে তাঁর (আ.) স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব পড়ে এবং তিনি (আ.) খুবই দূর্বল হয়ে পড়েন। এই দূর্বলতাও তাঁকে দমাতে পারেনি। একদিন তিনি বলেন, আমি অনেক দোয়া করেছি। এত দোয়া করেছি যে, যদি এটি অটল তকদীর না হয়ে থাকে তবে ইনশাআল্লাহ্ অনেক উপকার হবে। তারপর তিনি (আ.) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি আমার সন্তানদের জন্যও কখনো এমন অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হই নি।

তিনি কেবল নিজেই দোয়াতে ব্যস্ত ছিলেন না বরং অন্যান্য খোদ্দামদের ডেকে বলেন, তোমরা সারা রাত দোয়া কর। আর এভাবে তোমরা তোমাদের ভাইয়ের সাহায্য কর।

দয়া-মায়ার এই মূর্তিমান পুরুষের অবস্থা চিন্তা করুন! নিজ শিষ্যের জন্য তাঁর ব্যকুলতা দেখুন! তিনি (আ.) এক সকাল বেলা বলেন, "আমি ক্ষণে ক্ষণে চাইতাম, দু'-চার মিনিটের জন্য ঘুমাই। কিন্তু আমি জানিনা ঘুম কোথায় উড়ে গেল!" । তখন সেবকরা আরয করেন, হুযুর! এখন গিয়ে বিশ্রাম নিন। তিনি (আ.) বলেন, "এটি আমার এখতিয়ারের বাইরে। আমি কীভাবে আরাম করতে পারি যেখানে কি-না আমার দরজার সামনে থেকে 'হায়! হায়!' আওয়াজ আসছে। আমি তো সেই ব্যাথা-বেদনা ও কষ্টও দেখতে পারব না যা মৌলভী সাহেব পেয়েছেন। এজন্য আমি উপরেও যাই নি।" (সীরাতে মসীহ মওউদ, পৃষ্ঠা ১৯০-১৯৪, লেখক: ইয়াকুব আলী ইরফানী)

এক এতিম বালকের প্রতি সহানুভূতি ও শুশ্রূষা: এই ঘটনা বর্ণনা না করলে তাঁর এই গুণের বর্ণনা অপূর্ণই থেকে যাবে। 'ফিযা' নামি এক এতিম বালক ছিল। পূর্বে সে মির্যা নিযামুদ্দীন সাহেবের ঘরে থাকত। কিন্তু তাদের কঠোরতা সহ্য করতে না পেরে সে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাড়িতে চলে আসে। সে নিরক্ষর, রাগী এবং আদব-কায়দা সর্ম্পকে অনবহিত ছিল। একবার নিজের অসচেতনতার কারণে ফুটন্ত গরম পানি তার সমস্ত শরীরে পড়ে যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তা শুনে ততটাই ব্যথিত হন যতটা তাঁর নিজ পুত্রের জন্য ব্যথিত হতেন।

তিনি (আ.) সার্বক্ষণিক তার শুশ্রূষায় নিয়োজিত থাকেন। সেই বালকের সারা শরীরে সদ্য ধুনা তুলা দিতেন এবং সাবধানতার সাথে দেখাশুনা করতেন। তিনি (আ.) সেই বালকের চিকিৎসার জন্য টাকা খরচ করতে কৃপণতাও করেন নি এবং নিজ হাতে কাজ করতে কুণ্ঠাবোধও করেন নি। তার দেখাশুনা, খাবার ও ঔষধের ব্যাপারে কোন কমতি করেন নি। স্বয়ং নিজে উপস্থিত থেকে সব কিছুর ব্যবস্থা করতেন। তাকে সর্বদা শান্তনা দিতেন আর বলতেন, 'যদি এই দুর্ঘটনা থেকে সে বেঁচে যায় তবে সে পুণ্যবান হবে।' পরিশেষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই কথা বাস্তবে রূপায়িত হয়।

সবাই জানে, তখন সে এক ময়লা ও নোংরা দেহের এতিম বালক ছিল, কোন উচ্চ বংশের সাথেও তার পারিবারিক সম্পর্ক ছিল না। এমন চরম বিপদের সময় নিকটাত্মীয়রাও বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক দীর্ঘ সময় তার চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষায় নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। কেবল নিজেই তার সেবায় লেগে ছিলেন না বরং বাড়ির সবাইকে এই দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, তার আরাম-আয়েশ এবং চিকিৎসায় যেন কোন কমতি না থাকে। এতিমদের লালন-পালন এবং তাদের সেবা-শুশ্রূষার এটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। *(সীরাতে মসীহ মওউদ, পৃষ্ঠা ২৮৮-২৮৯, লেখক: ইয়াকুব আলী ইরফানী)*

পরিশেষে আমরা এটিই বলতে পারি, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্তা ছিল এক মুর্তিমান রহমত স্বরূপ। তিনি রহমত ছিলেন নিজ আত্মীয়ের জন্য আর রহমত ছিলেন নিজ বন্ধুদের জন্য, রহমত ছিলেন নিজ শত্রুর জন্য আর রহমত ছিলেন নিজ প্রতিবেশীর জন্য, আর রহমত ছিলেন নিজ ভৃত্যদের জন্য আর রহমত ছিলেন যাচনাকারীদের জন্য আর রহমত ছিলেন সর্বসাধারণের জন্য, আর জগতে কোন ছোট বা বড় দল এমন নেই যাদের জন্য তিনি রহমতের সুবাস না ছড়িয়েছেন। তিনি রহমত ছিলেন ইসলামের জন্য, যার সেবা, প্রচার ও প্রসার এবং যাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনি আত্মোৎসর্গীকৃত অবস্থায় নিজ জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত বরং নিজ জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিপরায়ণতা

মাওলানা নাভিদুর রহমান
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

অতিথি আপ্যায়ন সব যুগে, সব সমাজে একটি প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। মানুষের চারিত্রিক সৌন্দর্যের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক এটি। একই সাথে এটি চারিত্রিক মানদণ্ডও বটে। একটি সমাজের জন্য এটি প্রাণ স্বরূপ। অতিথি আপ্যায়ন সমাজে পারস্পরিক সম্মান এবং শান্তি ও সৌহার্দ্যের স্পৃহা সৃষ্টি করে। আর এর মাধ্যমে হিংসা এবং বিদ্বেষ দূর হয়। কুরআন শরীফও একে নবীগণের গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছে *(সূরা যারিয়াতঃ২৫-৩১)*। মহানবী (সা.) অতিথি আপ্যায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যত প্রাপ্তিতে যখন তিনি কিছুটা চিন্তিত হয়ে ঘরে ফেরত আসলেন তখন তাঁর সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে উৎসাহ দিয়ে তাঁর কিছু গুণের কথা উল্লেখ করে বলেন, আপনার মাঝে এসব গুণ রয়েছে, আপনাকে কখনোই খোদা তা'লা ধ্বংস করবেন না। সেসব গুণের মাঝে একটি ছিলো 'অতিথি আপ্যায়ন'। অর্থাৎ নবুয়্যত প্রাপ্তির পূর্বেও তাঁর (সা.)-এর মাঝে এ গুণ বিদ্যমান ছিল। আর নবুয়্যত প্রাপ্তির পর তিনি (সা.) মানবজাতির জন্য অন্যান্য বিষয়ের মতো এ বিষয়েও সর্বোত্তম আদর্শ রেখে গেছেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুবর্তিতায় এবং তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি তাঁর মনিবের ন্যায় এ যুগে চারিত্রিক উৎকর্ষের এক অতুলনীয় মান প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর অতিথি আপ্যায়ন তো হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। আর এর কারণ হলো পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা তাকে ইলহামের মাধ্যমে এ ব্যাপারে তাকিদ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'তোমার কাছে দূর দূর থেকে লোক আসবে।' একইসাথে এ ইলহামও হয়েছিল-

لَا تُصَعِّرْ لِخَلْقِ اللّٰهِ وَلَا تَسْأَمْ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি তুমি মুখ গোমড়া করো না আর মানুষকে দেখে বিরক্ত হয়ো না'। মোটকথা একদিকে অনেক মানুষের আগমনের সংবাদ আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দিয়েছেন, অপরদিকে এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হৃদয়কে পূর্বেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। অতিথি আপ্যায়নের এমন ঘটনা অসংখ্য, এগুলোর মাঝ থেকে কতিপয় আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। এসব ঘটনা একদিকে যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথি আপ্যায়নের দৃষ্টান্ত, একই সাথে সেগুলোতে তাঁর সরলতা, নিজ সাহাবাদের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালোবাসা এবং সামগ্রিকভাবে মানবতার প্রতি তাঁর সহানুভূতির একটি সুন্দর চিত্র ফুটে ওঠে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রকৃতিতে অতিথি আপ্যায়ন যেন গেঁথে দেয়া হয়েছিল। কেননা যে বংশে তাঁর জন্ম সে বংশ অতিথি আপ্যায়নে বিখ্যাত ছিল। অতিথিদের জন্য তাঁদের দরজা সর্বদাই প্রশস্ত ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মা অতিথি আপ্যায়নে বিশেষ খ্যাতি রাখতেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রকৃতি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিল। যারা জলসা অথবা অন্য কোন উপলক্ষে কাদিয়ান আসতেন হোক আহমদী বা অ-আহমদী; তারা তাঁর ভালোবাসা ও আতিথেয়তা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতো। তিনি (আ.) তাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দের প্রতি সর্বোচ্চ খেয়াল রাখতেন। তার চরিত্রে লৌকিকতা একেবারেই ছিল না এবং প্রত্যেক মেহমানের সাথে একজন আপন মানুষের মতো সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের খেদমত এবং অতিথি পরায়ণতায় প্রশান্তি পেতেন। প্রাথমিক যুগের ব্যক্তিরা বর্ণনা করেন, যখন কোন মেহমান আসত তিনি সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন, হাত মিলাতেন, কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। তাদেরকে সম্মানের সাথে বসাতেন। গরমের মৌসুম হলে শরবত আর শীতের মৌসুম হলে চা ইত্যাদি দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। থাকার বন্দোবস্ত করতেন এবং খাবার ইত্যাদি সম্পর্কে মেহমানখানার ব্যবস্থাপকদের নির্দেশ দিতেন যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিতের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রতীয়মান হয় দাবীর পূর্বে এবং পরে অতিথি আপ্যায়নে তাঁর আচরণ ছিল একইরকম। অর্থাৎ এমন নয় যে, দাবীর পূর্বে যখন মেহমান কম ছিল, তখন বেশি মনোযোগ ছিল আর দাবীর পর যখন মেহমানের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন মনোযোগ হ্রাস পেয়ে গেল।

এখন আমি কিছু ঘটনাবলির আলোকে সম্মানিত পাঠকদের সামনে এই বিষয়টি উপস্থাপন করবো যে, কীভাবে তিনি (আ.) অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন।

মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একবার একজন মেহমান এসে বললো, আমার কাছে বিছানা নেই। হুযুর (আ.) হাফেয হামেদ আলী সাহেবকে (হুযুরের খাদেম) বললেন, একে লেপ দিয়ে দিন। হামেদ আলী সাহেব নিবেদন করলেন, সে লেপ নিয়ে চলে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। হুযুর (আ.) বললেন, " যদি সে লেপ নিয়ে চলে যায় তবে তার পাপ হবে আর যদি লেপ ছাড়া শীতে মারা যায় তবে আমাদের পাপ হবে।" এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে ব্যক্তি বাহ্যত কোন এমন ব্যক্তি ছিল না যে, সে কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এসেছে। বরং তার আচরণে সন্দেহ হচ্ছিলো। কিন্তু তারপরও হুযুর (আ.) তার আপ্যায়নের ব্যাপারে কোন পার্থক্য করেন নি।

অতিথি আপ্যায়ন সম্পর্কিত একটি গল্প: মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, "এক রাতে কয়েকজন অতিথি এসে উপস্থিত হলো। উম্মুল মু'মিনীন কিছুটা অস্থির হলেন এই ভেবে যে, পূর্বেই তো ঘর নৌকার মতো পরিপূর্ণ এখন এদের কোথায় থাকতে দেয়া হবে। সে সময় অতিথি আপ্যায়ন সম্পর্কে হুযুর (আ.) বেগম সাহেবাকে একটি গল্প শোনালেন। মুফতি সাহেব বলেন, যেহেতু তখন আমাকে যে কক্ষে থাকতে দেয়া হয়েছিল সেটা হুযুর (আ.)-এর কক্ষের সঙ্গে লাগোয়া ছিল আর পুরনো হওয়ার কারণে সহজেই আওয়াজ আমার কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল। হুযুর (আ.) বলেন, "একবার এক জঙ্গলে এক মুসাফিরের চলতে চলতে রাত হয়ে গেলো। সে কোন গত্যন্তর না দেখতে পেয়ে একটি গাছের নিচে বসে পড়লো। সে গাছে একজোড়া পাখির বাসা ছিল। পুরুষ পাখিটি তার সঙ্গীনীকে বললো, এই ব্যক্তি আজকে আমাদের অতিথি। আমাদের উচিত তার আপ্যায়ন করা। সঙ্গীনী তার সাথে একমত পোষণ করলো। তারা দু'জনে পরামর্শ করলো শীতের রাত, অতিথির উষ্ণতা প্রয়োজন। আমাদের কাছে তো আর কিছু নেই আমরা আমাদের বাসাটিই নিচে ফেলে দেই, যেন সে এটি জ্বালিয়ে উষ্ণতা পায়। কথামতো তারা নিজেদের বাসাটি নিচে ফেলে দিল আর সেই পথিক সেটি জ্বালিয়ে শীত থেকে রক্ষা পেল। অতঃপর পাখি দু'টি পরামর্শ করলো, এখনতো অতিথির জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের কাছে তো আর কিছু নেই তাই চলো আমরা নিজেরাই তার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ি, যেন অতিথি আমাদের মাংস খেতে পারে। সে অনুযায়ী তারা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লো, আর সেই পথিক তাদের ভুনা মাংস খেয়ে তার ক্ষুধা নিবারণ করলো।

ছোট্ট একটি গল্পের মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কতই না সুন্দরভাবে অতিথি আপ্যায়নের গুরুত্ব উম্মুল মুমিনীনকে শিখিয়েছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন নিজেও অতিথি আপ্যায়নে এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত ছিলেন। কিন্তু এটা যে সময়ের ঘটনা, তখন কাদিয়ানে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ততটা সুলভ ছিল না। এ কারণে অতিথিদের আধিক্য অনেক সময় ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সৃষ্টি করত। এ অস্থিরতাও এ রকম সমস্যার কারণেই সৃষ্ট। সে সময় অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে লঙ্গরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা হুযুরের ঘর থেকেই হতো।

একজন নও মুসলিম, ডাক্তার আব্দুস সালাম সাহেবের ঘটনা: ডাক্তার সাহেব বর্ণনা করেন, একবার আমি হুযুর (আ.)-এর সাক্ষাত লাভের আশায় দু'দিনের ছুটি নিয়ে লাহোর থেকে কাদিয়ান আসলাম। বাটালা পৌঁছাতে রাত হয়ে গেল তাই সেখানে রাত কাটিয়ে ভোর বেলা কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং সূর্যোদয়ের সামান্য পরে কাদিয়ানে পৌঁছলাম। আমি যখন 'মসজিদ আকসায়' পৌঁছলাম হুযুর (আ.)-এর সাথে পথেই দেখা হলো। হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে বললাম, আমি রাত বাটালায় কাটিয়ে পায়ে হেঁটে এসেছি। হুযুর বললেন, আপনার তো অনেক কষ্ট হয়েছে। আমি বললাম, কোন কষ্ট হয়নি। হুযুর বললেন, 'আচ্ছা চা পান করবেন, না কি লাচ্ছি?।' আমি বললাম, লাচ্ছি। হুযুর বললেন, 'মসজিদ মোবারকে বসুন।' আমি মসজিদে বসার কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম বায়তুল ফিকরের দরজা খুলে হুযুর স্বয়ং একহাতে একটি ছোট পাতিলে লাচ্ছি এবং লবণদানীতে লবণ নিয়ে আসলেন। নিজেই লাচ্ছি পরিবেশন করলেন। ইতোমধ্যে আরো কয়েকজন বন্ধু উপস্থিত হলেন আর তাদেরকেও লাচ্ছি খাওয়ালেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ সানৌরি সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কয়েকজনকে দাওয়াত দিলেন। কিন্তু খাবার খাওয়া শুরু হওয়া মাত্র, আরো সমসংখ্যক মেহমান উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং মসজিদ মোবারক লোকজনে ভরে গেল। হুযুর ঘরে খবর পাঠালেন। আম্মাজান হুযুরকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন আর বললেন, খাবার তো অল্প লোকের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। পোলাও যদি কোনরকমে হয়েও যায় জর্দা তো কোনভাবেই সম্ভব না। হুযুর বললেন, জর্দার পাত্র নিয়ে আসো। হুযুর জর্দার পাত্রের ওপর একটি রুমাল রাখলেন। রুমালের নীচ দিয়ে হুযুর জর্দায় নিজের আঙ্গুল প্রবেশ করালেন। এরপর বললেন, ঠিক আছে এখন পরিবেশন কর। আল্লাহ্ বরকত দিবেন। আর এমনই হলো। সবাই পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করলো।

মির্যা বশীর আহমদ (রা.) হযরত আম্মাজানের বরাতে বর্ণনা করেন, এমন ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে। এমন হতো পঞ্চাশজনের খাবার পাকানো হয়েছে কিন্তু একশ জন উপস্থিত হয়ে গেছে। কিন্তু হুযুরের বরকতে তা সবার জন্য পর্যাপ্ত হয়ে যেতো।

হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেন, একবার কেউ হুযুরকে একটি মোরগ পাঠালো। হুযুরের জন্য পোলাও পাকানো হলো কিন্তু ঘটনাচক্রে সেদিনই নবাব মোহাম্মদ আলী খান (রা.)-এর পরিবার আমাদের বাসায় আসলেন। আমি হুযুরকে বললাম পোলাও তো খুব সামান্য। হুযুর পোলাও-এর মধ্যে দম করলেন এবং সেই পোলাও সবার জন্য পর্যাপ্ত হলো, এমনকি মওলানা নুরুদ্দীন (রা.) এবং আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রা.)-এর ঘরেও পাঠানো হলো। যা অবশিষ্ট ছিল তা কাদিয়ানের অন্যান্য কয়েকটি ঘরেও পাঠানো হলো। যেহেতু সেটি 'বরকতময় পোলাও' হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিল তাই অনেকেই আমাদের কাছে এসে সেই পোলাও চেয়ে নিয়ে যায়।"

হযরত আব্দুল্লাহ সানৌরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বায়তুল ফিকর-এ শুয়ে ছিলেন, আর আমি হুযুরের পা টিপে দিচ্ছিলাম। জানালায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হলো। আমি উঠে খুলতে গেলাম কিন্তু হুযুর তৎক্ষণাৎ উঠে জানালা খুললেন। এরপর নিজের স্থানে বসে বললেন, 'আপনি আমার মেহমান। আর মহানবী (সা.) বলেছেন অতিথির সম্মান করা উচিত।"

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "আমি যখন কাদিয়ান থেকে লাহোর ফেরত যেতাম, হুযুর (আ.) আমাকে নিজের সাথে নিয়ে যাবার জন্য খাবার দিয়ে দিতেন। একবার সন্ধ্যায় আমার ফেরত যাওয়ার সময় হুযুর আমার জন্য খাবার চেয়ে পাঠালেন। যে খাদেম খাবার নিয়ে আসলো, সে খোলা অবস্থায় খাবার নিয়ে আসলো। হুযুর বললেন, খাবার ঢেকে আনা উচিত ছিল, এখন মুফতি সাহেব কিভাবে খাবার নিয়ে যাবেন? এরপর হুযুর নিজ পাগড়ির এক পার্শ্ব ছিঁড়ে সেটা দিয়ে খাবার বেঁধে দিলেন।"

কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ পেশাওয়ারী সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একবার আমি এবং আব্দুর রহীম খান সাহেব (রাঃ) মসজিদ মোবারকে বসে হুযুরের ঘর থেকে আসা খাবার খাচ্ছিলাম। খাবারে আমি একটি মাছি পাই। যেহেতু আমি মাছিকে ঘৃণা করতাম, তাই আমি সে খাবার না খেয়ে রেখে দিলাম। খাদেমা সে খাবার উঠিয়ে নিয়ে গেল। ঘটনাচক্রে ঠিক সে সময় হুযুর ঘরে খাবার খাচ্ছিলেন। খাদেমা হুযুরকে পুরো ঘটনা বললো। হুযুর তৎক্ষণাত নিজের খাবারের প্লেটটি খাদেমার হাতে দিয়ে দিলেন এমনকি হাতের লোকমাটিও। খাদেমা আনন্দের সাথে সে খাবার নিয়ে এসে আমাকে দিয়ে বললো, নিন হুযুরের তাবার্রুক নিন।"

হযরত মুনশী জাফর আহমদ কপুরথলী সাহেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মাগরিবের পর কয়েকজন সাহাবীসহ মসজিদ মোবারকের দ্বিতীয় ছাদে অবস্থান করছিলেন। এদের মাঝে মির্যা নিযামুদ্দীন সাহেবও ছিলেন, যিনি খুবই দরিদ্র ছিলেন এবং তার কাপড়ও পুরানো ও মলিন ছিল। ইতোমধ্যে আরো কয়েকজন উপস্থিত হলেন, যারা পরবর্তীতে লাহোরী আখ্যায়িত হয়েছিলেন, তারা হুযুরের কাছে জায়গা করে নিতে লাগলেন আর মির্যা নিযামুদ্দীন পিছনে সরে যেতে লাগলেন। এমনকি তিনি শেষ পর্যন্ত জুতা রাখার স্থানে গিয়ে বসলেন। এর মাঝে খাবার এসে গেল। হুযুর একহাতে রুটি ও অপরহাতে তরকারীর বাটি নিয়ে বললেন, "মির্যা নিযামুদ্দীন! চলো আমরা ভেতরে গিয়ে খাই। এই বলে তাকে মসজিদ মোবারকের উঠানের সাথে যে কক্ষটি রয়েছে সেখানে নিয়ে গেলেন। মিয়া নিযামুদ্দীন আর হুযুর একসাথে খাবার খেলেন আর বাকিরা বাইরে রয়ে গেল। যারা সামনে এসে বসেছিল তাদের চেহারায় লজ্জার ছাপ স্পষ্ট ছিল।"

হযরত মুনশী জাফর আহমদ কপুরথলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার আসাম থেকে দু'জন ব্যক্তি (অ-আহমদি মেহমান) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সংবাদ পেয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে আসলেন। তারা যখন মেহমানখানায় পৌঁছলেন, খাদেমদের বললেন তাদের ব্যাগ নামাতে এবং খাটের ব্যবস্থা করতে। খাদেমরা তাদের দিকে মনোযোগ দিল না, আর এ বলে এড়িয়ে গেল যে, আপনারা ব্যাগ নামান শোয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এত দীর্ঘ সফর করে আসা এ দুই মেহমান এমন ব্যবহারে ভীষণ কষ্ট পেলেন আর তারা তখনই এক্কাগাড়িতে বাটালার দিকে রওনা হলেন। হুযুর যখন এ ঘটনা জানতে পারলেন তৎক্ষণাৎ বাটালার দিকে রওয়ানা দিলেন। আমি এবং আরো কয়েকজন তার সাথে রওয়ানা দিলাম। কাদিয়ান থেকে আড়াই মাইল দুরে তিনি তাদের খুঁজে পেলেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও ভালবাসার সাথে তাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন আর তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। তাদের বললেন, আপনারা গাড়িতে উঠুন আমি হেঁটে আপনাদের সাথে আসছি। তারা লজ্জিত হয়ে গাড়িতে উঠলেন না। মেহমানখানার সামনে আসতেই হুযুর নিজ হাতে তাদের ব্যাগ নামাতে চাইলেন তবে তাঁর খাদেমরাই মেহমানদের ব্যাগ নামালেন। এরপর হুযুর তাদের সাথে অত্যন্ত ভালোবাসা এবং সহানুভূতির সাথে কথা বললেন আর তাদের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। পরদিন যখন তারা ফেরত যাচ্ছিলেন তখন পায়ে হেঁটে অনেকদূর পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে আসলেন।"

এখানে মাত্র কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সীরাত বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সৌভাগ্য দিন আমরা যেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আদর্শকে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি, আর তাঁর মিশনকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারি। (আমিন)

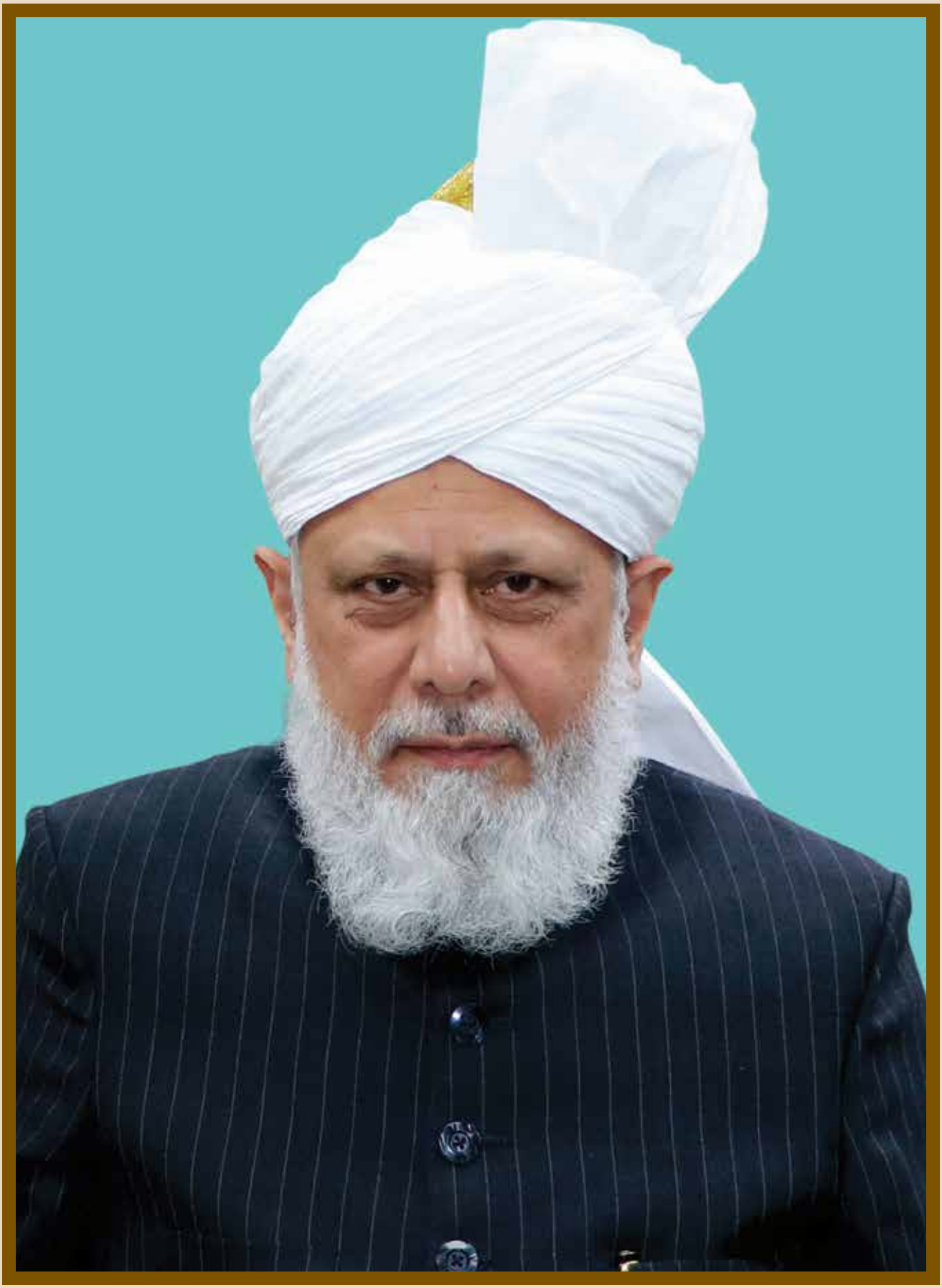

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba), Khalifatul Masih The V

শিক্ষক মণ্ডলী, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
Teachers, Jamia Ahmadiyya Bangladesh

মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব গভর্নরস

মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল

মাওলানা বশিরুর রহমান
ভাইস প্রিন্সিপাল-১

মাওলানা ইয়াছিন আহমদ
ভাইস প্রিন্সিপাল-২

মাওলানা সালেহ আহমদ
শিক্ষক

মাওলানা মাসুম আহমদ
শিক্ষক ও সম্পাদক 'নুরুদ্দীন'

মাওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ
শিক্ষক ও হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট

মাওলানা রশিদ আহমদ
শিক্ষক

মাওলানা মুহাম্মদ সালেহ
শিক্ষক

মাওলানা নাসের আহমদ
শিক্ষক

মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার
শিক্ষক

মাওলানা মোহাম্মদ আল হক
শিক্ষক

মাওলানা নাভিদুর রহমান
শিক্ষক

মাওলানা হাজারী আহমদ আল-মুনিম
শিক্ষক

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সাথে প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

লন্ডন বাংলাডেস্কে নিযুক্ত মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাহেব এবং জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের
শিক্ষকগণের সাথে প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

সৈয়দ মনসুর শাহ সাহেব, নায়েব আমীর, যুক্তরাজ্যের সাথে প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশনাল উকিলুত তবশীর, যুক্তরাজ্যের সাথে প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

২০১৭ সালে বাংলাদেশের সালানা জলসায় আগত হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি
মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেবের সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষকবৃন্দ

হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষকবৃন্দ মিটিংরত অবস্থায়

হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষক ও ছাত্রদের মতবিনিময়

হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধির সাথে ২০১৭ সালে শাহেদ কোর্স সম্পন্নকারী জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষার্থীবৃন্দ

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী ও নৈশভোজ অনুষ্ঠানে ছাত্রদের নসীহত করছেন
হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক পুরস্কার বিতরনী ও নৈশভোজ অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরন করছেন
হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলীর সাধারণ পরিচিতি

মাওলানা মুহাম্মদ আল হক
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

হাদীস শরীফে হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের একটি লক্ষণ এটি বর্ণনা করা হয়েছে-

يَفِيْضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ اَحَدٌ

অর্থাৎ মসীহ মওউদ (আ.) সম্পদ বন্টন করবেন কিন্তু তা কেউ গ্রহণ করবে না বা তা গ্রহণ করার লোক পাওয়া যাবে না। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে 'মাল' বলতে টাকা-পয়সা বা সোনা-রুপা নয় বরং এখানে 'মাল' বলতে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের ভান্ডার বুঝানো হয়েছে। যেগুলো হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বন্টন করার ছিল। এ জন্যই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন-

وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے
اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار

অর্থাৎ, সেই ধনভান্ডার যা হাজার বছর যাবৎ লুকায়িত ছিল, এখন কেউ যদি তা লাভে আকাঙ্খী হয় তবে আমি তা দিতে পারি।

অতএব ইতিহাস সাক্ষী, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই উল্লেখিত আধ্যাত্মিক ধনভান্ডার ব্যাপকহারে বন্টন করেছেন যা অআহমদীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এই আধ্যাত্মিক ধনভান্ডার তাঁর অনুসারীদের জন্য আধ্যাত্মিক জীবনের মহান পাথেয়। তাঁর পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদীস বুঝতে অনেক বেশী সাহায্য লাভ হয়। কারণ এই পুস্তকাবলী ঐশী সাহায্য ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে লেখা হয়েছে। যেমনটি তিনি স্বয়ং বলেছেন-

"এই রচিত পুস্তকাবলী ঐশী সাহায্যে লেখা হয়েছে। আমি এর নাম ওহী ও ইলহাম তো রাখি না কিন্তু এটি অবশ্যই বলছি যে, খোদা তা'লার বিশেষ ও অলৌকিক সাহায্যে আমার হাতের মাধ্যমে এই পুস্তকাবলী রচীত হয়েছে।" *(সিররুল খিলাফাহ, রুহানী খাযায়েন, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪১৫)*

আল্লাহ্ তা'লার ফযল ও কৃপায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনী ও প্রবন্ধসমূহ এত মর্যাদাপূর্ণ ও কল্যাণকর যে, অআহমদীরাও এটি স্বীকার না করে থাকতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন ব্যতীত দাওয়াত ইলাল্লাহ এবং সত্য ধর্মের পুনর্জীবন অসম্ভব বিষয়। আর এই পুস্তকাবলী খোদা তা'লার সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক কায়েম করার ও রুহানী ময়দানে উন্নতি লাভ করার একটি বড় মাধ্যম।

সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক দায়িত্ব হল, সে যেন বেশি বেশি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী অধ্যয়ন করে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল, সংক্ষিপ্তাকারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর পরিচিতি তুলে ধরা, যেন সেগুলো অধ্যয়নের ব্যাপারে কিছু দিক-নির্দেশনা লাভ হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনী, আদেশ-উপদেশ ও উদ্ধৃতিসমূহকে নিম্নোক্ত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

(১) রুহানী খাযায়েন (গ্রন্থাবলী);
(২) মলফুযাত (আদেশ-উপদেশ);
(৩) মজমুয়া ইশতেহারাত; (বিজ্ঞাপন)
(৪) মকতুবাত (পত্রাবলী)।

রুহানী খাযায়েন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লিখিত সমস্ত পুস্তকের সেট 'রুহানী খাযায়েন' নামে আখ্যায়িত যা ২৩ খন্ড সম্বলিত। এই খন্ডসমূহে পুস্তকের ধারাবাহিকতা, রচনার সাল অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

রুহানী খাযায়েনের প্রতিটি খন্ডে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বইয়ের প্রারম্ভে পরিচিতি ও বিষয়সূচি দেয়া হয়েছে। যার সাহায্যে সম্পর্কযুক্ত পুস্তকের বিষয়বস্তুকে সহজে অনুধাবন করা যেতে পারে। এমনকি সূচিপত্রের সাহায্যে প্রয়োজন অনুযায়ী কোন উদ্ধৃতি বা বিষয় খুঁজতে সহজ হয়।

পুস্তকের সংখ্যা: রুহানী খাযায়েন সেট-এ অন্তর্ভুক্ত বইয়ের সংখ্যা মোট ৮৩। যদি বারাহীনে আহমদীয়া ২য়, ৩য়, ৪র্থ অংশ, এভাবে ইযালায়ে আওহাম হিস্যা দওম, নূরুল হক হিস্যা দওম, এছাড়া আরবাঈন ২য়, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যাকে পৃথক পৃথক গণনা করা হয় তাহলে এই সংখ্যা ৯২ হয়।

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২৩ খন্ডের সমষ্টি 'রুহানী খাযায়েন সেট'-এ সমস্ত বইয়ের মোট পৃষ্ঠা প্রায় এগার হাজারের কিছু বেশি রয়েছে।

আরবী পুস্তকসমূহ: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর বেশ কয়েকটি পুস্তক বাগ্মীতাপূর্ণ আরবী ভাষায় রচনা করেছেন।

সেগুলোর পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১.কেরামাতুস্ সাদেক্বীন ২.তোহ্ফায়ে বাগদাদ ৩.হামামাতুল বুশরা ৪.নূরুল হক, হিস্যা আউয়াল ৫.নূরুল হক, হিস্যা দওম ৬.সিররুল খিলাফাহ ৭.হুজ্জাতুল্লাহ ৮.আঞ্জামে আথম ৯.মিনানুর রহমান ১০.নাজমুল হুদা ১১.লুজ্জাতুন নূর ১২.হাকীকাতুল মাহদী ১৩.সীরাতুল আবদাল ১৪.এ'জাযুল মসীহ ১৫.ইতমামুল হুজ্জত ১৬.মুয়াহেবুর রহমান ১৭.খুত্বায়ে ইলহামিয়া ১৮.আল হুদা ওয়াত্ তাবসেরাতু লেমান ইয়ারা।

কতক পুস্তকের কিছু অংশ আরবী ভাষায় রচনা করা হয়েছে। যেমন, আল ইসতেফ্তা মূলত হাকীকাতুল ওহীরই অংশ। অনুরুপভাবে আত্ তবলীগ প্রকৃতপক্ষে আয়নায়ে কামালাতে ইসলামেরই অংশ। কিন্তু কখনো কখনো সেগুলোকে পৃথকভাবে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এই কারনেই সেগুলোকে আরবী পুস্তকের সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু অনুযায়ী প্রকারভেদঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর কতক পুস্তক তো কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রণীত। কিন্তু কতক পুস্তক মূলবিষয় সম্বলিত। সেইসব পুস্তক, যার বিষয়বস্তু কোন বিশেষ ধর্ম, ফিরকা বা কোন বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত- এর বিবরন নিম্নে উল্লেখ করছি–

খ্রিষ্টধর্মঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সময় হিন্দুস্তান ও সারাবিশ্বে খ্রিষ্টধর্ম অনেক বেশী সক্রিয় ছিল। আর সত্যান্বেষীদের সবচেয়ে অধিক সম্মুখীন হতে হয়েছে খ্রিষ্টানদের। এই কারনেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীতে সবচেয়ে অধিক খ্রিষ্টধর্মকেই আলোচনায় আনা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত পুস্তক যেগুলোর মূল বিষয়ই হল খ্রিষ্টধর্ম।

১. জঙ্গে মুকাদ্দাস; ২.কিতাবুল বারিয়্যা; ৩.চশমায়ে মসীহী; ৪.আঞ্জামে আথম; ৫.আনওয়ারুল ইসলাম; ৬.সিরাজুদ্দীন ঈসায়ী কি চার সাওয়ালোঁ কে জওয়াব; ৭.যিয়াউল হক; ৮.তোহ্ফায়ে কায়সারিয়া; ৯.সিতারায়ে কায়সারিয়া; ১০.নাজমুল হুদা; ১১.হুজ্জাতুল ইসলাম; ১২.ইতমামুল হুজ্জাত; ১৩.সাচ্চায়ি কা ইযহার; ১৪.নূরুল হক, হিস্যা দওম; ১৫.আল বালাগ; ১৬.নূরুল কুরআন, হিস্যা দওম; ১৭.তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া। এগুলো ছাড়াও আংশিকভাবে অসংখ্য পুস্তকে খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়।

হিন্দু ও শিখধর্মঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সময় ইসলাম খ্রিষ্টধর্মের পর দ্বিতীয় নম্বরে কতক হিন্দু ফিরকার পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিদ্বন্দিতার সম্মুখীন ছিল। হিন্দু ফিরকার মধ্যে আর্য ধর্ম, সনাতন ধর্ম, ব্রাহ্মসমাজ এবং শিখধর্ম সম্পর্কে হুজুর (আ.) বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। এই সব পুস্তকে তিনি সেই ফিরকাগুলোর আক্বীদার ভ্রান্তি প্রমাণ করেন। যেগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ বেশি উল্লেখযোগ্য-

১. পুরানী তাহরীরেঁ;
২. সুরমা চশমায়ে আরিয়া;
৩. শাহানায়ে হক;
৪. সৎ বচন;
৫. সনাতন ধরম;
৬. আরিয়া ধরম;
৭. কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম;
৮. চশমায়ে মা'রেফাত;
৯. পয়গামে সুলেহ্;
১০. তাকসীমে দাওয়াত;
১১. ইস্তেফ্তা।

মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের উপর পুস্তকঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর পুস্তক সমুহে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী 'ওফাতে ঈসা' বা ঈসার মৃত্যুর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এইসব পুস্তকসমূহের মূল বিষয়ই হযরত ঈসা (আ.)-এর স্বাভাবিক মৃত্যু ও হিজরত। পুস্তকগুলো নিম্নরূপ:

১. ইযালায়ে আওহাম, হিস্যা আউয়াল, হিস্যা দওম; ২.ফতেহ ইসলাম; ৩.তৌযীহে মারাম; ৪.মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ; ৫.আলহক মুবাহাসা; ৬.তোহফায়ে বাগদাদ; ৭.হামামাতুল বুশরা; ৮.আসমানী ফয়সালা; ৯.রাযে হাক্বীকাত; ১০.ইতমামুল হুজ্জাত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতাঃ সাধারনত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর প্রতিটি পুস্তকে তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সেইসব পুস্তক যেগুলোকে তিনি বিশেষভাবে তাঁর সত্যতার দলীল হিসেবে রচনা করেছেন অথবা যেগুলোর যুক্তি ও ইতিহাস অনুযায়ী বিষয় বস্তু তাঁর সত্যতার দিকে নির্দেশ করে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ–

১.আসমানী ফয়সালা; ২.নিশানে আসমানী; ৩.তোহ্ফায়ে গুলড়বিয়া; ৪.আরবা'ঈন; ৫.সিরাজুম মুনির; ৬.তিরিয়াকুল কুলুব; ৭.নুযুলুল মসীহ; ৮.হাক্বীকাতুল ওহী; ৯.নুরুল হক, হিস্যা দওম; ১০.ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী; ১১.এ'জাযে আহমদী; ১২.এ'জাযুল মসীহ; ১৩.দাফেউল বালা; ১৪.কেরামাতুস্ সাদেকীন; ১৫.তোহ্ফায়ে গযনবীয়া; ১৬.হুজ্জাতুল্লাহ; ১৭.আঞ্জামে আথম; ১৮.তোহ্ফায়ে নদওয়া; ১৯.লুজ্জাতুন নূর।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)–এর আবির্ভাব: এটিও এমন একটি বিষয় যার সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর অনেক পুস্তকে আলোচনা করেছেন। যার মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহ উল্লেখযোগ্য:

১.জরুরতুল ইমাম; ২.হাক্বীকাতুল মাহদী; ৩.নিশানে আসমানী; ৪.শাহাদাতুল কুরআন; ৫.নূরুল হক, হিস্যা দওম।

নবুয়ত সংক্রান্ত বিষয়: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ১৯০১ সালের পরের অধিকাংশ রচনায় নবুয়্যত সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সব থেকে উল্লেখযোগ্য পুস্তক 'এক গালাতি কা ইযালা'। এই পুস্তকে হুযুর বিশেষভাবে তাঁর নব্যুয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নবুয়্যতের সংজ্ঞা, নবুয়্যতের প্রকারভেদ, নবুয়্যতের তাৎপর্য্য এবং নিজের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

জিহাদ সংক্রান্ত বিষয়: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জিহাদের উপরেও তাঁর অনেক পুস্তকে আলোচনা করেছেন। যাই হোক তাঁর 'গভর্ণমেন্ট আংরেজী আওর জিহাদ' পুস্তকে জিহাদের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরুপভাবে নুরুল হক, হিস্যা আউয়াল,-এতেও জিহাদ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মের উপর তুলনামূলক আলোচনা: নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহে অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সত্য ধর্ম ইসলামের বিশেষভাবে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

১.বারাহীনে আহমদীয়া (প্রথম ৪ খন্ডের সবগুলোতে); ২.পুরানী তাহরীরেঁ; ৩.সুরমা চশমায়ে আরিয়া;

৪.চশমায়ে মা'রেফাত; ৫.কিশতিয়ে নূহ; ৬.মিয়ারুল মাযাহেব;

চ্যালেঞ্জের উপর প্রতিষ্ঠিত পুস্তক: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহের খন্ডন লেখা অথবা সেগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুস্তক লিখতে হাজার হাজার টাকার পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কারোরই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামর্থ্য লাভ হয় নি। পুস্তকগুলো নিম্নরূপ:

১। বারাহীনে আহমদীয়া– প্রত্যেক চার খন্ড, ১০,০০০ রুপি;
২। সুরমা চশমায়ে আরিয়া– ৫০০ রুপি;
৩। কেরামাতুস সাদেকীন– ১০০০ রুপি;
৪। নুরুল হক– ৫০০০ রুপি;
৫। এ'জাযে আহমদী –১০০০ রুপি;
৬। ইতমামুল হুজ্জত– ১০০০ রুপি;
৭। তোহফা গুলড়াবিয়া– ৫০০ রুপি।

এগুলো ছাড়াও তিনি (আ.) নিম্নলিখিত পুস্তকসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, পুস্তক লিখতে অথবা সেগুলো খণ্ডন করার শর্তে নিজের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়া স্বীকার করে নেয়ার অঙ্গীকার করে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন।

১.এ'জাযুল মসীহ; ২.হুজ্জাতুল্লাহ; ৩.আল হুদা ওয়াত্ তাবসেরাতু লেমান ইয়ারা।

মালফুযাত: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর উল্লেখিত পুস্তকসমূহ ছাড়াও হুজুর (আ.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে খুৎবা, বক্তৃতা, এবং উপদেশাবলী দিয়েছেন সেগুলোকেও সাহাবায়ে কেরামগন সংরক্ষন করেছেন। যা সেই সময় পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সেগুলোকে পুস্তক আকারে 'মালফুযাত' নামে প্রকাশ করা হয়েছে। মলফুযাত–এর প্রথম সংস্করনে তা ১০ খন্ডে ছিল, পরবর্তীতে নতুন সংস্করনে তা ৫ খন্ডে প্রকাশিত হয়।

মজমুয়া ইশতেহারাত: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজ জীবনের বিভিন্ন সময়ে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে কোন তাহরীক, উপদেশ, প্রস্তাব, কোন বিষয় স্পষ্ট করা অথবা চ্যালেঞ্জের উপর প্রতিষ্ঠিত ইশতেহার প্রকাশ করেছেন। যেগুলোকে পরবর্তীতে 'তবলীগে রিসালাত' নামে পুস্তক আকারে সর্ব সাধারনের উপকারের জন্য ১০ খন্ডে এবং পরে 'মাজমুয়া ইশতেহারাত' রুপে তিন খন্ডে প্রকাশ করা হয়েছে।

মাকতুবাতে আহমদ: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর নিজ জীবনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিকে যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছেন সেগুলোকে সর্ব সাধারনের উপকারের জন্য পরবর্তীতে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। যার নাম দেয়া হয়েছে 'মাকতুবাতে আহমদ'। 'মাকতুবাতে আহমদ'-এর খন্ডের সংখ্যা ৭টি। এই চিঠি-পত্র গুলোতেও আমাদের জন্য অনেক জ্ঞানগর্ভ ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তির উপকরণ আছে। যাই হোক এগুলোর অধ্যয়ন করাও আমাদের জন্য জরুরী। আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার থেকে যথোপযুক্ত উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন। (আমিন)

(তথ্যসুত্রঃ সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান, ১৪ মার্চ ২০১৩ইং)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী পাঠের গুরুত্ব ও ফযিলত

মৌলভী মোহাম্মদ মজীদুল ইসলাম
মুয়াল্লেম ওয়াক্‌ফে জাদীদ

সূদীর্ঘ প্রতিক্ষার পর জগৎময় চরম নৈরাজ্য, অনৈতিকতা আর অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে তার অবসানকল্পে আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ পৃথিবীতে আগমন করেছেন। যার আগমনের জন্য, যার আধ্যাত্মিক কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য গওস, কুতুব, আওলিয়া ও উম্মতের মুজাদ্দেদগণ আকূল আকাঙ্খা নিয়ে চাতক পাখির ন্যায় আকাশপানে তাকিয়ে ছিলেন। বিশ্বব্যাপী ক্রুশীয় মতবাদের বিনাশ আর ইসলামের বিজয় এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র আত্ম-সংশোধনের অব্যর্থ প্রতিষেধক তথা সাধু ব্যক্তিগণের আত্মার খোরাক নিয়ে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আগমন করেছেন। তাঁর নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। মহান আল্লাহ্ তাঁকে যে আধ্যাত্মিক ধনভান্ডার প্রদান করেছেন তা তিনি আমাদের জন্য পুস্তকাকারে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদেরকে যা দান করে, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের বিরত করে, তা থেকে বিরত থাক। আর আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে অতি কঠোর। *(সূরা হাশর, আয়াত: ৭ শেষাংশ)*

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে আগত মহাপুরুষগণের আদেশ নিষেধের ওপর আমল করার জন্য তাঁর নির্দেশনাবলী পাঠ করা অপরিহার্য। যারা মহাপুরুষের নির্দেশনাবলী পাঠ করে না, তারা চরম দুর্ভাগা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁর কাছে ধন-সম্পদের ভান্ডার থাকবে, কিন্তু তা নেবার বা গ্রহণ করার জন্য কেউ প্রস্তুত থাকবে না।" সুতরাং হযরত মসীহ্ মওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যে আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার তাঁর পুস্তকাবলীর মাঝে রেখে গেছেন, যারা তা গ্রহণ ও অধ্যয়ন করে, তারা প্রকৃত অর্থেই সৌভাগ্যবান।

হযরত মসীহ্ মওউদ মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'নিশানে আসমানী'-তে লিখেন, "এক যুগে তরবারীর মাধ্যমে বহু কাজ সমাধা হয়েছিল যখন সে তরবারী ছিল হযরত আলী (রা.)-এর হস্তে। এই আখেরী যমানায় সে তরবারী আমাকে প্রদান করা হয়েছে। এভাবে যে কাজ তখন ইসলামের স্বপক্ষে তরবারীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল, এখন সে কাজ আমার (লেখনীর) মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। এটা এদিকেই ইঙ্গিত করছে যে, আখেরী যমানার ইমাম **'সুলতানুল কলম'** হবেন এবং তাঁর কলম যুলফিকারের (তরবারীর) কাজ করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কর্তৃক রচিত পুস্তাকাবলীকে বলা হয় **'রূহানী খাযায়েন'**। যার বাংলা হচ্ছে 'আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডার'। তাঁর লেখার কিছু বৈশিষ্ট উল্লেখ করা হচ্ছে, যা থেকে তাঁর পুস্তকাবলী পাঠের গুরুত্ব ও ফযিলত সহজে উপলব্ধি করা যাবে।

জীবনদায়ক কথা:

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- "যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে 'অমৃত সুধা' পান করবে, যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে, সে কখনো মৃত্যু বরণ করবে না। এগুলো হচ্ছে জীবনদায়ক কথা যা আমি বলি। আর ঐ সব জ্ঞান যা আমার মুখ থেকে বের হয় তদ্রুপ যদি অন্য কেউ বলতে পারে তা হলে মনে করো যে, আমি খোদা তা'লার পক্ষ হতে আসিনি।" *(রূহানী খাযায়েন খণ্ড:৩ , ১০৪ পৃষ্ঠা)*

রূহুল কুদ্দুসের সাহায্য:

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লিখেন, 'খোদার শক্তি আমার সাথে না থাকলে আমি তো একটি শব্দও লিখতে পারবো না। বার বার লিখতে লিখতে দেখেছি, এক খোদার হাত লিখছেন। কলম ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভেতরের আবেগ ক্লান্ত হচ্ছে না। অনুভূতিতে মনে হচ্ছে যে, এক একটি শব্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আসছে।' *(মলফুযাত, ২য় খণ্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা)*

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য:

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, খোদা তা'লা আমাকে মাটিতে লুকিয়ে থাকা সম্পদকে দুনিয়ায় প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়েছেন। আর আমি যেন উজ্জ্বল মনিমুক্তার ওপর অপবিত্র আপত্তির যে কাদা ছিল তা পবিত্র করি। *(মলফুযাত ১ম খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)*

জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার:

যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, লেখার ধারাবাহিকতায় আমি সম্পূর্ণ দলিলের জন্য বিশ্লেষন ভিত্তিক সত্তর পাঁচাত্তরটি বই লেখেছি। আর এর মধ্যে প্রত্যেকটি পৃথকভাবে এরূপ পরিপূর্ণ যে, যদি কোন সত্য ও প্রকৃত প্রমাণ অনুসন্ধানকারী গভীর মনোযোগ সহকারে তা পাঠ করে, তবে তার কাছে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার মতো তথ্যের ঘাটতি দেখা দিবে না। আমি নিজের জীবদ্দশায় জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার জমা করে দিয়েছি। *(মলফুযাত ৫ম খণ্ড, ৫৭৮ পৃষ্ঠা)*

কলমে লেখা জ্ঞানের অস্ত্র:

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এখন জেনে নাও যে, এ সময়ে প্রকৃত অর্থেই তরবারীর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হচ্ছে কলমের। আমাদের বিরোধীরা সন্দেহ পোষন করে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রতারণার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সত্য ধর্মের ওপর আক্রমণ করতে চায়। তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, আমি যেন জ্ঞানের অস্ত্র পরিধান করে এই বিজ্ঞান ও উন্নত জ্ঞানের যুদ্ধ ময়দানে অবতরণ করি। আর আধ্যাত্মিক নির্ভীকতা ও গোপনীয় শক্তির চমৎকারিত্ব (কারিশমা) প্রদর্শন করি। আমি কি কখনো এই ময়দানে যোগ্য হতে পারতাম ? এতো কেবল আল্লাহ্ তা'লার কলম। আর তাঁর অসীম মেহেরবাণী। তিনি চান যে, আমার মত দুর্বল মানুষের হাতে এ ধর্মের সম্মান প্রকাশ হোক। *(মলফুযাত ১ম খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)*

নফসের (প্রবৃত্তির) সংশোধনের এক উপায়:

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রা.) বলেছেন- নফসের সংশোধনের জন্য অতীব জরুরী একটি বিষয় হলো, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই পাঠ করা। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, লোকেরা নিয়মিতভাবে হযরত সাহেবের বই পড়ে না। প্রত্যেক আহমদী হযরত সাহেবের কোন না কোন বই প্রত্যেক দিন কমপক্ষে এক পাতা করে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলে খুব বড় উপকার হবে। হযরত মসীহ মওউদ আলায়হেস্ সালামের বই-এ সেই আলো ও জ্ঞান আছে যা কুরআন করীমে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এগুলো তাঁর বইয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। একজন সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিও তা সহজেই বুঝতে পারবে। এর কারণ হল এ বইসমূহে সেই আলো ও হেদায়েত আছে, যা কুরআন করীমে আছে। *(আনোয়ারুল উলুম ১০ম খণ্ড, ৯২-৯৩ পৃষ্ঠা)*

ফেরেশতার আগমন:

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রা.) আরো বলেন- এ সমস্ত পুস্তক এমন এক ব্যক্তির হাতে লেখা যার কাছে ফেরেশতা আসতো। আর এ বই লেখার সময়ও ফেরেশতা নাযেল হত। সুতরাং হযরত সাহেবের বই যে ব্যক্তি পাঠ করবে, তার ওপরেও ফেরেশতা নাযেল হবে। *(মালায়েকাতুল্লাহ্, আনোয়ারুল উলুম, ৫ম খণ্ড, ৫৬০ পৃষ্ঠা)*

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনার উদাহরণ:

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর উদাহরণ হচ্ছে পাহাড়ের ওপর বর্ষিত হয়ে বয়ে যাওয়া পানি। বাহ্যিকভাবে স্রোতের দিক দেখা যায় না। কিন্তু তা নিজেই তার স্রোতের দিক তৈরী করে নেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনায় আল্লাহ্ তা'লার জালাল (মহিমা) রয়েছে। আর তা সকল হতে উর্ধ্বে। যেমন পাহাড়ের প্রকৃতদৃশ্য সে সব ছবি থেকে অনেক বেশি সুন্দর যা মানুষ বছরের পর বছর পরিশ্রমের মাধ্যমে তৈরীর পর জাদুঘরে রাখে। তদ্রূপ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনা সব থেকে অগ্রগামী। মানুষ কত পরিশ্রমের মাধ্যমে পাহাড়ের ছবি অঙ্কন করে, কিন্তু তা কি প্রকৃত পাহাড়ের কাজ দিতে পারে! লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সমুদ্রের ছবি তৈরী করা হয়। কিন্তু সমুদ্র যখন রুদ্র মূর্তি ধারণ করে তখনকার দৃশ্যের কাজ কি ছবি দিতে পারবে? ছবির মাঝে না ঐ আকর্ষণ আছে আর না প্রভাব। তদ্রুপ অন্য রচনা হচ্ছে সেই ছবি, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী হচ্ছে সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য। *(খুৎবাতে মাহমুদ, ১৩ তম খণ্ড, ২২১ পৃষ্ঠা)*

যুবকদের সংশোধনের মাধ্যম:

এ সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা যুবকদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন-

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর শিক্ষাকে খুব উত্তমভাবে এবং খুব সুন্দরভাবে এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে রেখেছেন। কিন্তু যেসব যুবক এ সম্পদের দিকে মনোযোগী হয় না, আমাদের উচিত আমরা যেন এ দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। *(মাশআলে রাহ, ২য় খণ্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা)*

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই পড়লে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে আপনি সম্মানিত হবেন:

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন- সুতরাং আজ আপনাদের কাছে আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক উপদেশ আর যা আমি বার বার পুনরাবৃত্তি করেছি, তা হলো আপনারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এর ফলে আপনারা শয়তানের আক্রমণ থেকে

রক্ষা পাবেন। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে সম্মানিত হবেন। আর আপনাদের জীবনের সব কাজে আল্লাহ্ তা'লা বরকত দান করবেন। *(মাশআলে রাহ্, ২য় খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)*

প্রত্যহ তাঁর (আ.) পুস্তক পাঠ করা উচিতঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন-

"হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তক ও তাঁর পুস্তকে বর্ণিত জ্ঞান যেন প্রত্যেক আহমদীর প্রাণ ও আত্মা হয়। আপনারা যদি তাঁর পুস্তকে বর্ণিত জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন তা হলে আপনারা আহমদীয়ত বুঝতে অসমর্থ হবেন। এমতাবস্থায় আপনাদের সংশোধন করা কঠিন হবে, কারণ আপনারা এমন দেহের মত হবেন যাতে জীবন থাকবে না। সুতরাং ঐ বুনিয়াদি উপদেশ যা আমি এ সময় বাচ্চাদের করতে চাচ্ছি তা এই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পড়ার অভ্যাস গড়ে তোল। মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক বা মলফুযাতের কোন অংশ পড়ে নাও। মলফুযাত থেকে যদি শুরু কর তবে বেশী ভাল হবে। কারণ এর মধ্যে যে সব বর্ণনা করা হয়েছে তা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। আর যে ভাষায় এগুলো সংরক্ষিত করা হয়েছে তাও সহজবোধ্য।" *(মাশআলে রাহ্, ২য় খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)*

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মাণ হয় যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর পুস্তক পাঠের গুরুত্ব ও ফযিলত অপরিসীম। সুতরাং আমরা যারা খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক তাঁকে (আ.) ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে মান্য করেছি সবার আগে আমাদেরকেই তাঁর পুস্তকাদি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা দুনিয়ার সর্বস্তরের আদম সন্তানকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক পাঠের মাধ্যমে দ্বীন-দুনিয়া ও পরকালের ফায়দা লাভের সৌভাগ্য দান করুন- (আমীন)

তথ্যসূত্র: সীরাতে সুলতানুল কলম, পাক্ষিক আহমদী, মাসিক আনসারুল্লা ও মাসিক আহ্বান থেকে সংগৃহীত।

ধন্য আমি

মুহাম্মদ উসমান গনি
ছাত্র, ৪র্থ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

ধন্য আমি হলাম ভাই
আহমদী হয়ে,
বেঁচে থাকতে পারি যেন
আহমদীয়াতেরই মাঝে।
জীবন আমার ধন্য হবে
জামাতের কাজ করলে,
জামাতের কাজ করবো মোরা
সকলে মিলে একসাথে।
আহমদীয়াতের জন্য আমি
হতে পারি কুরবান,
আহমদী থেকে রাখব আমি
আহমদীয়াতের সম্মান।
যখন আমি যুগ খলীফার
সকল নির্দেশ মানব,
তখন আমি সঠিকভাবে
জীবন গড়তে পারব।

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর শৈশবকাল

মাসুম আহমদ
ছাত্র, ৪র্থ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আমাদের প্রিয় নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, শেষ যুগে বা আখেরী যুগে মুসলমানদের অবস্থা হবে শোচনীয়। মুসলমানদের মধ্য থেকে ঈমান হারিয়ে যাবে। সেই ঈমানকে ফিরিয়ে আনতে এবং পুনরায় জীবিত করতে একজন প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী আবির্ভুত হবেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) ১৮৩৫ খ্রি: ১৩ই ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৪ই শাওয়াল ১২৫০ হিজরী শুক্রবার ফজরের নামাযের সময় ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জন্মের কয়েক বছর আগে ১৩শ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হযরত সৈয়্যদ আহমদ বেরলভী (রহ.)এবং হযরত ইসমাইল শহীদ সাহেব হাজারা জেলার অন্তর্বর্তী বালাকোট নামক স্থানে শহীদ হয়েছিলেন। এবং ইংরেজ শাসক শক্তির অধীনে খ্রিষ্টান ধর্ম বন্যার ন্যায় পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতের অবশিষ্ট সমগ্র অংশকে গ্রাস করতে চলেছিল। এর পরই পাঞ্জাবের পালা ছিল।

খ্রিষ্টানরা সর্বপ্রথমে, ঠিক ১৮৩৫খ্রি: অর্থাৎ- হযরত আকদাস (আ.)-এর জন্মের বছরে লুধিয়ানায় তাদের প্রথম প্রচার মিশন কায়েম করে। সুতরাং তা কেমন ঐশী হস্তক্ষেপ ছিল যে, একদিকে ক্রুশীয় ধর্ম প্রচারের ব্যাবস্থা হচ্ছে, অপর দিকে খোদাতা'লা এই ফিৎনা অংকুরে বিনাশের উদ্দেশ্যে ক্রুশ ভঙ্গকারীকে অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আ.)-কে নিকটবর্তী এক জেলায় আবির্ভূত করলেন। অতঃপর এই ক্রুশ ভঙ্গকারী যখন দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য আদিষ্ট হলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম বয়াত নেবার স্থান হিসেবে লুধিয়ানাকে মনোনিত করলেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) শিখ আমলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের আগে তাঁর (আ.) পরিবার উদ্বেগময় অবস্থায় ছিল। কিন্তু তাঁর (আ.) জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর (আ.) পরিবারের নির্বাসন অবস্থা ও আথির্ক কষ্ট দূরীভূত হয়ে যায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যমজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি (আ.) ভূমিষ্ট হওয়ার আগে একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয় এবং কয়েকদিন পরেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি (আ.) কখনো কখনো বলতেন "আমার মনে হয়, এই প্রকারের জন্মের মাধ্যমে খোদাতা'লা আমার মধ্য থেকে নারীসূলভ স্বভাব সম্পূর্নরূপে দূরীভূত করেন।"

তাঁর (আ.) যমজ জন্মগ্রহণ করার মধ্যে আরও একটি বিষয় নিহিত ছিল। এতে সেই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হলো, যা কোন কোন ইসলামি পুস্তকে লিখিত ছিল অর্থাৎ- "প্রতিশ্রুত মাহদী যমজ জন্মগ্রহণ করবেন"।

এবার আসা যাক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শৈশব কালে: একটি ফারসি প্রবাদ আছে "হোনহার দারাখ্ত কে চিক্নে চিকনে পাত।" অর্থাৎ ঠিক এই প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর শৈশব কালও অতিশয় পবিত্র ও উজ্জল ছিল। অন্য ছেলে-মেয়েদের সাথে অনর্থক খেলাধুলা বা দুষ্টামিতে যোগদান করা তাঁর অভ্যাস ছিল না। নবীগনের চিরন্তন রীতি অনুযায়ী একবার তাঁর ছাগল চরাবার সুযোগও হয়েছিল। তা এরূপে যে, একবার তিনি গ্রামের বাইরে এক কূপের উপর বসে ছিলেন। বাড়ি থেকে তাঁর কোন জিনিস আনার প্রয়োজন হলো। এক ব্যক্তি পাশেই ছাগল চরাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে বাড়ি থেকে অমুক জিনিস এনে দাও। সেই ব্যক্তি বলল, আমার ছাগলগুলো দেখবে কে? তিনি (আ.) বললেন, তুমি যাও আমি দেখবো। তদনুযায়ী তিনি তাঁর ছাগলগুলো চরাতে লাগলেন। এভাবেই তিনি নবীদের সুন্নত পালন করলেন। তিনি (আ.) যখন সহপাঠীদের সাথে মিলিত হতেন তখন তিনি তাদেরকে তাঁর (আ.) জন্য দোয়া করতে বলতেন।

একেবারে ছোটবেলাতেই একজন সমবয়স্কা মেয়েকে [পরে যার সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল] তিনি বলেন,"দোয়া কর যেন খোদা আমাকে নামাজ পড়ার সৌভাগ্য দেন"।

তাঁর পবিত্র স্বভাব, সাধু চরিত্রের অভ্যাসের জন্য যে কেউ তাঁকে অন্তঃর্চক্ষু দিয়ে দেখেছেন সে তাঁর ভক্ত হয়েছেন।

বেলুচিস্তান নিবাসী মিয়া মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বলেন, আমাকে বোরহানুদ্দিন সাহেব (রা.) বলেছেন যে, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কিল্লা মিঞা সিংহের মৌলবী গোলাম রসূল সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন। ঐ মজলিসে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে মৌলবী গোলাম রসূল সাহেব বললেন,"এ জামানায় কোন নবী হওয়ার থাকলে এই ছেলে নবুয়্যতের যোগ্য।" মৌলবী সাহেব একজন অলি ও কেরামত সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর (আ.)-এর দেহে স্নেহভরে হাত বুলাতে বুলাতে এ কথা বলেছিলেন। বোরহানুদ্দিন (রা.) বলেন যে, তিনি নিজেও ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন।

এবার হযরত আকদাস (আ.)-এর শিক্ষা সর্ম্পকে আলোচনা করা যাক। ইংরেজ শাসনের আগে পাঞ্জাবে শিখ রাজত্ব ছিল। শিক্ষার প্রতি শিখ গভর্নমেন্টের আদৌ কোন দৃষ্টি ছিল না। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সন্তানদের পাঠদানের উদ্দেশ্যে নিজ ঘরেই শিক্ষক রাখতেন। হযরত আকদাস (আ.)-এর শিক্ষার জন্যও এমন ব্যবস্থা হয়েছিল।

হযরত (আ.)-এর বয়স যখন ৬/৭ বছর, তখন একজন ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ মৌলবীকে তাঁর জন্য শিক্ষক হিসেবে উপযুক্ত বেতনে নিযুক্ত করা হয়। তিনি হুযুর (আ.)-কে কোরআন শরীফ ও কিছু ফার্সী কিতাব পড়িয়েছিলেন। এই শিক্ষকের নাম ছিল ফযলে ইলাহি। হুযুর (আ.)-এর বয়স যখন আনুমানিক ১০ বছর হয় তখন একজন আরবী জানা আলেম যার নাম ফযল আহমদ তিনি শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। হুযুর (আ.) বলেন, "আমার শিক্ষা খোদা তা'লার ফযলের অর্থাৎ তাঁর বিশেষ কৃপার একটা প্রাথমিক বীজ হওয়ার ফলে সেই শিক্ষকদের নামের প্রথম শব্দও 'ফযল'-ই ছিল। তাঁর (আ.)-এর শিক্ষকগণ দীনদার ও বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর (আ.)-এর বয়স যখন ১৭/১৮ বছর হলো তখন তিনি গুল আলী শাহ নামক শিক্ষকের কাছ থেকে আরবী ব্যকরণ, যুক্তিবিজ্ঞান এবং দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর সম্মানিত পিতা একজন প্রখ্যাত হেকিম ছিলেন। সুতরাং তাঁর কাছে তিনি হেকিমী চিকিৎসা বিষয়ক কতিপয় পুস্তকও পাঠ করেছিলেন।

উপরে উল্লেখিত তিন জন শিক্ষক যাদের কাছ থেকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তারা মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শিক্ষকগণ হানাফী, আহলে হাদীস ও শিয়া সম্প্রদায়ের ছিলেন। ফলে তিনি (আ.) তাদের কাছ থেকে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও ক্রিয়া-কর্ম, আকায়েদ, আমল সমন্ধে বেশ কিছুটা জ্ঞান অর্জন করেন।

বাল্যকাল থেকেই হযরত মসীহ মওউদ(আ.)-এর অভ্যাস ছিল সর্বদা বই-পুস্তক পাঠে মগ্ন থাকা, আর গরিব-মিসকিনদের মাঝে অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করা। বংশানুক্রমে মজুদকৃত পিতার লাইব্রেরীর নানাবিধ পুস্তকাদি তিনি দিবা-রাত্র অধ্যয়ন করতেন। তাছাড়া সাময়িকী, ম্যাগাজিন এবং সে যুগের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পাঠে মশগুল থাকা ছিল তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাস। জমিদার বংশের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও বন্ধু-বান্ধব ও সমবয়সীদের সঙ্গে মিলে-মিশে আড্ডা দেওয়া, আমোদ-প্রমোদে যোগদান করা হতে বিরত থাকতেন। স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন নিরীহ প্রকৃতির এবং লাজুক স্বভাবের। যৌবনে পদার্পন করে তিনি অধিকতর ধর্মভীরু হয়ে উঠলেন। ধর্মে-কর্মে, ইবাদতে, যিকরে ইলাহীতে এবং অন্যদেরকে ধর্ম শিক্ষাদানে রত থেকেই তিনি দিনাতিপাত করতেন।

এবার মসীহ মওউদ (আ.)-এর খেলাধুলা সর্ম্পকে আলোচনা করা যাক। উপরে যেই সময়ের (যুগের) আলোচনা করেছি, সে সময়ে সাধারনত কুস্তি, কাবাডি, মুগুর ভাঁজা এবং ভার মুগুর উত্তোলনের ব্যায়াম ও খেলা প্রচলিত ছিল। কর্মহীন লোকদের মধ্যে পাখি ধরা,পাখি পালন এবং মোরগ লড়াই এর সাধারণ প্রচলন ছিল। হযরত আকদাস (আ.) শেষোক্ত যাবতীয় আমোদ-প্রমোদগুলো স্বভাবত পছন্দ করতেন না। তথাপি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্য থেকে তিনি নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতেন। বাল্যকালেই তিনি সাঁতার শিখেন। কখনও কখনও কাদিয়ানের পুকুরগুলোতে তিনি সাঁতার কাটতেন এবং প্রথম জীবনে ঘোড়ায় চড়াও শিখেছিলেন। এগুলোতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তার (আ.)-এর বিশেষ ব্যায়াম ছিল পায়ে হেঁটে চলা। শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি (আ.) অনেক দূর দূরান্তে হেঁটে যেতেন এবং অত্যন্ত দ্রুত হাটতেন।

হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) বাল্যকাল থেকেই খোদার ভয়ে ভীত থাকতেন এবং সকল প্রকার পাপ ও অনর্থক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতেন এবং সমবয়স্কদের ভাল কাজের নসীহত করতেন।

আল্লাতা'লা আমাদের সবাইকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার উপর আমল করার তৌফিক দিন। (আমিন)

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের নসিহত প্রদান করছেন হুযুর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসে বক্তৃতা প্রদান করছে এক শিক্ষার্থী

বার্ষিক বনভোজন-২০১৭, সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৭, সিলেট মালনিছড়া চা-বাগানে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৭, সিলেট চা-বাগানের পথে

বার্ষিক বনভোজন-২০১৭, সিলেট যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনে

বার্ষিক বনভোজন-২০১৭, সিলেট 'লালা খাল'-এ জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৭, সিলেট 'লালা খাল'-এ জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের নিগরান শিক্ষকগণ

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক শিক্ষা সফর-২০১৭, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক শিক্ষা সফর-২০১৭, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে আনন্দঘন মূহুর্তে

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক শিক্ষা সফর-২০১৭, সেন্টমার্টিন সমুদ্র সৈকতে

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক শিক্ষা সফর-২০১৭, সেন্টমার্টিন প্রবাল দ্বীপে

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক শিক্ষা সফর-২০১৭, সেন্টমার্টিন কেয়াবনে

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক শিক্ষা সফর-২০১৭, সেন্টমার্টিন কেয়াবনে আনন্দঘন মূহুর্তে

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক শিক্ষা সফর-২০১৭, সেন্টমার্টিন সমুদ্র সৈকতে সাইকেল রেস

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বার্ষিক শিক্ষা সফর-২০১৭, কক্সবাজার হিমছড়ি ঝর্ণায়

ঘুরে এলাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সিলেট

মুহাম্মদ তারীফ হোসেন
ছাত্র, ৪র্থ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

জাফলং-এর সূর্য এইমাত্র বিদায় নিল। পেছনে রেখে গেল এক মোহনীয় আধাঁর। আমরাও বিদায় নিলাম জাফলং-এর নদী, পাথর, পাহাড় আর ধুলোবালির কাছ থেকে, সাথে নিয়ে একরাশ ভাল লাগার অনুভূতি। দেখলাম আর অভিভূত হলাম। **বার্ষিক বনভোজন ২০১৭**, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর আগমন সেই কাঙ্খিত মুহুর্তের। ২৪ শে জানুয়ারি রাত ১১ টা বেজে ৪৫ মিনিট। আমরা ৭০ জন। শিক্ষাগুরু ও শিক্ষানবিস। দুটি বাসে ভাগ হয়ে আমরা রওয়ানা হলাম। সদকা প্রদান ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে শুরু হলো আমাদের যাত্রা । **"সীরূ ফিল আরদ"** *(সূরা রূম : ৪৩)* অর্থাৎ- তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমন কর। খোদা তা'লার এ নির্দেশকে সামনে রেখেই মূলত জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ প্রতি বছর বনভোজনের আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এ বছর জাফলং ও সিলেটের বেশ কয়েকটি দর্শনীয় স্থানকে নির্বাচন করা হয়।

২৫ শে জানুয়ারি, সকাল ৬:০০টা। প্রায় ছয় ঘন্টা যাত্রার পর আমরা সিলেট আলিয়া মাদ্রাসার সম্মুখে পৌঁছলাম। প্রভাতের সূর্যোদয় আর মসজিদের আযান সিলেট শহরে স্বাগত জানালো আমাদেরকে। কাক ডাকা ভোরে পায়ে হেঁটে আমরা পৌঁছলাম হযরত শাহজালাল (রহ:)-এর মাজারে। শত শত জালালি কবুতর আবারো স্বাগত জানালো আমাদেরকে সেই পবিত্র ভূমিতে। পবিত্র আবেশে কিছুটা সময় কাটানোর পর আমরা আসলাম **'পাঁচ ভাই রেস্টুরেন্ট'** নামক প্রসিদ্ধ রেস্টুরেন্টে। উদ্দেশ্য প্রভাতের আহার গ্রহণ। তারপর বের হলাম পদভ্রমনে। হেঁটে হেঁটে সিলেট শহরের ঠান্ডা উপভোগ করলাম। অবলোকন করলাম ধীরে ধীরে একটি শহরের জেগে উঠা।

প্রায় সকাল ৭ টার দিকে আমরা রওয়ানা হলাম শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে। চার দিকে ধানক্ষেত, তার মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইউনিট। এত সুন্দর মনোরম পরিবেশ দেখে পুলকিত হলাম। অচিরেই আমাদের জামেয়া এমন পরিবেশ লাভ করবে জেনে আনন্দিতও হলাম। কিছুটা সময় এখানে কাটানোর পর আমরা বিদায় নিলাম।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নাসের আহমদ সাহেব ঘোষণা দিলেন, আমরা এখন বাংলাদেশের সর্বপ্রথম চা বাগানটি পরিদর্শন করতে যাচ্ছি **'মালনীছড়া চা বাগান'**। 'সর্বপ্রথম' কে দেখতে পাবে এই প্রতিযোগিতা করে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। সাথে তিন জন গাইড। মালনীছড়ার সবুজ-শ্যামল পরিবেশ মনের মাঝে এক শীতলতার সৃষ্টি করল। শহরের কোলাহল থেকে দুরে এসে এমন একটি পরিবেশে নিজেকে যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। জীবনের সকল দৃশ্যপট হঠাৎ করেই পালটে গেল। চারদিকে যেন শুধুই শান্তি। মজার বিষয় হলো জাফলং যাওয়ার পথে আমাদের জন্য আরও কি কি চমক অপেক্ষা করছে তার সম্পর্কে আমরা কেউই অবগত নই। তাই সামনে কি চমক আসছে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম।

আবারো শুরু হলো আমাদের যাত্রা। এবার এসে থামলাম **'টিলাগড় ইকো পার্ক'**-এ। এ যেন সবুজের আরেক সমাহার। সবাই কিছুক্ষণ এদিক সেদিক ঘুড়ে বেরালাম। কেউ কেউ টং দোকানে চা পান করল। এখানে একটি চিড়িয়াখানা ছিল, কিন্তু বর্তমানে এখানে কোনো প্রাণী সংরক্ষিত নেই। এখানে বেশ কিছু টিলা আছে। আমরা কয়েকজন মিলে একটি টিলায় উঠলাম। সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আল হক সাহেব এবং অফিস সহকারী জনাব মজিদুল ইসলামও ছিলেন। আমরা আমাদের শ্রেণিশিক্ষক সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেবের সাথে কিছু ছবি তুললাম। এবার এখান থেকে বিদায়ের পালা। আমরা সবাই গাড়িতে উঠলাম। আমাদের গাড়ির চাকা আবারো ঘুরতে শুরু করল নতুন এক চমকের উদ্দেশ্যে।

পথিমধ্যে **'সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে'** আমরা কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি নিলাম। এরপর আবারো শুরু হলো আমাদের পথচলা। পথের দু'পাশের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা চলতে থাকলাম। বেশ কিছুক্ষণ যাত্রার পর আমরা আরেকটি জায়গায় থামলাম।

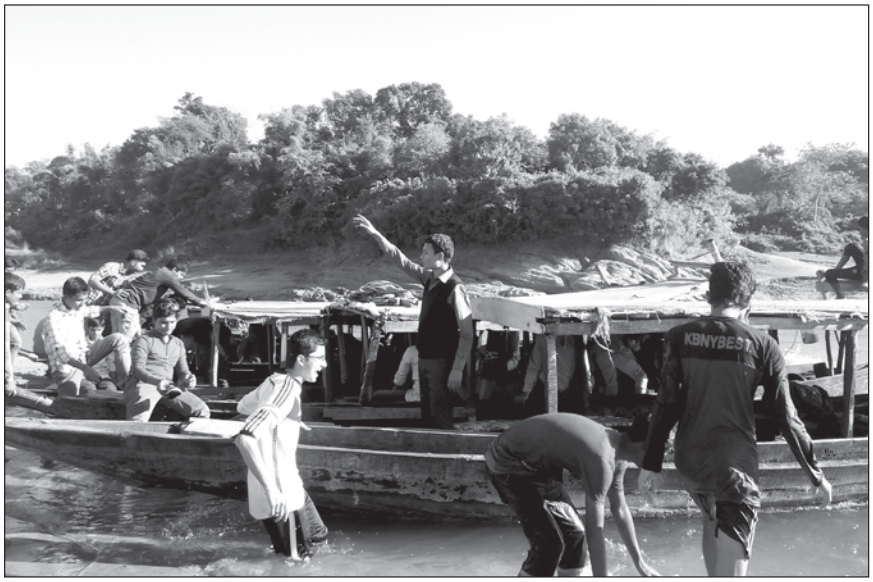

'লালা খাল'। এ যেন আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চমক। দীর্ঘ বাস ভ্রমনের পর এবার পালা নৌ-ভ্রমনের। পাঁচটি নৌকা ভাড়া করা হলো। প্রতি নৌকায় ১৪ জন করে। আমাদের আনন্দ আরো বেড়ে গেল যখন আমরা জানতে পারলাম আমাদের দুপুরের খাবার নৌকায় পরিবেশন করা হবে। নৌকায় সবাই চড়ে বসলাম। আমাদের নৌকা চলতে শুরু করল। আর আমরা নদীর দু'পাশের অদ্ভুত মনকারা দৃশ্য দেখতে দেখতে খেতে থাকলাম। দ্রুত খাওয়ার পর্ব শেষ করলাম যেন লালা খাল ও এর দু'পাশের সৌন্দর্য্য অবলোকনে বিঘ্ন না ঘটে। কিছুদূর এগুতেই আমাদের আর্শ্চয হতে হলো। লালা খালের ঘোলা পানি হঠাৎ করেই স্বচ্ছ নীল পানিতে রূপ নিল। লালা খালের প্রতিটি বাঁক আমাদেরকে সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এর প্রতিটি বাঁক যেন কোন দক্ষ শিল্পির অতি যত্নে আঁকা এক একটি ছবি। নিচে স্বচ্ছ নীল পানি, উপরে নীল আকাশে ভেসে থাকা সাদা মেঘ, দু'পাশের নয়নাভিরাম দৃশ্য, আর সামনে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়, যেন আরেকটু এগুলেই পাহাড়ের কাছে পৌছে যাব। কিন্তু যতই এগুচ্ছি ততোই সে দূরে সরে যাচ্ছে, যেন সে খেলা করছে আমাদের সাথে। এ হলো আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য। দেখলাম আর মুগ্ধ হতে থাকলাম। যেন এ চলার শেষ না হয়, যেন এ দেখার শেষ না হয়। খালের পানি কখনো সবুজ, কখনো নীল, আবার কখনো স্বচ্ছ বর্নহীন। চলতে চলতে আমরা জিরো পয়েন্টে পৌছলাম। নৌকা থেকে নেমে ঝাপিয়ে পরলাম পানিতে। যদিও পানি গোড়ালি থেকে একটু বেশি। এত অল্প পানিতে এত বেশি স্রোত আমি কখনো দেখিনি। এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছি তো পায়ের নিচ থেকে বালি সরে যাচ্ছে, আর পা ধীরে ধীরে দেবে যাচ্ছে। অনেক আনন্দ পেলাম। সবাই এদিক সেদিক ছুটাছুটি করল। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাসুম আহমদ সাহেবের নিগ্রানিতে আমরা সবাই ভাইস প্রিন্সিপাল জনাব বশিরুর রহমান সাহেবের সাথে গ্রুপ ছবি তুললাম। যখন আমরা লালা খাল ছেড়ে যাচ্ছি তখন প্রায় বিকাল। লালাখালের সৌন্দর্য্য চিরদিনের জন্য গেঁথে গেল মনে। প্রতিটি বাঁক যেন এখনো আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এবার আমাদের মূল লক্ষ্য জাফলং। পথ যেন শেষ হয়না। চলতে চলতে খুব কাছের পাহাড়ি দৃশ্য উপভোগ করতে থাকলাম। এক সময় অবসান হল দীর্ঘ অপেক্ষার। প্রায় সন্ধ্যার দিকে আমরা পৌছলাম জাফলং-এ। সূর্য জাফলং-এর নদীর পানি ছুই ছুই করছে। শেষ বিকেলের এ অপরুপ দৃশ্যে সারা দিনের ক্লান্তি উড়ে গেল। ঠান্ডা বাতাসে মন ভরে গেল। বুক ভরে শ্বাস নিলাম। ঐ কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে পার্শবর্তী দেশ ভারতের পাহাড়, এর মাঝে গড়ে উঠা শহর, শহরের রাস্তায় চলছে গাড়ি। জাফলং-এর সৌন্দর্য্যলিখে বোঝানো যাবে না। এখানে ছোট ছোট দোকানগুলোতে ভারতীয় পণ্য স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। অনেকেই সেখান থেকে কিছু কেনা কাটা করল। নির্ধারিত সময় শেষ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সৈয়দ মোজাফ্ফর সাহেবের সাথে কথা বলতে বলতে ফিরে আসলাম গাড়িতে। এবার শুরু হলো বিদায় যাত্রা। আবারো ফিরে আসার তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে আমরা সিলেটকে বিদায় জানালাম।

রাত ২:৩০ মিনিট। ২৬শে জানুয়ারি। এখন আমরা ঢাকায়। দীর্ঘ যাত্রা শেষে আমরা ফিরে এলাম জামেয়াতে। অনেক ভালো লাগার অনুভূতি আর ক্লান্তি নিয়ে আমরা এখন ঘুমাতে যাব। আরো একটি বনভোজনের অপেক্ষায় শুরু হবে আমাদের আরেকটি দিন।

প্রভুর খোঁজে

সফিক আহমদ চৌধুরী
ছাত্র, ৪র্থ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

প্রভু তোমায় খুঁজেছি অনেক রাত্রি-নিশি জেগে,
ব্যর্থ হয়ে গিয়েছি কখনও একটুখানি রেগে।
বাপ-দাদার ধর্মই যদি ধর্ম হয়ে থাকে,
এত ধর্ম কেন দিলে এই ধরনীবুকে?
জন্ম নেয় মানব সন্তান যে ধর্মেতে,
বাল্য থেকেই সত্য বলে জানে শুধুই তাকে।
এত ধর্ম দুনিয়াতে! আসবে কত কি জানি!
ভেবে পাইনা কোনটাকে সত্য বলে মানি।
জন্ম যদি হতাম আমি হিন্দু হয়ে ভাই,
ঠাকুর মশাই বলত এটাই সত্য, আর তো ধর্ম নাই।
যদি আসতাম পৃথিবীতে নাসারা-খ্রিষ্টান হয়ে,
বলত ফাদার যাস্নে কোথাও যিশুই মোদের তরে।
ইহুদী হয়ে আসতাম যদি এই ধরনীতে ভাই,
বিশ্বাস থাকত সিনাগগ ছাড়া কোন উপাসনালয় নাই।
জন্মিতাম যদি আমি বৌদ্ধ পিতার ঘরে,
ভাবতাম সদা গৌতম ছাড়া আর তো কেউ নাইরে!
জন্ম তোমার হোকনা কেন যে ধর্মেই ভাই
প্রভু দিয়েছেন বিবেক-বুদ্ধি, একটু খাটানো চাই!

শিক্ষা সফর-২০১৭

সাকিবুল হাসান
ছাত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

মহান আল্লাহ্ তা'লা এ পৃথিবীকে কত সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন, তা চোখে না দেখলে কল্পনা করা সম্ভব নয়। কত রঙ-বেরঙের গাছ-পালা, পশু-পাখি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বন-জঙ্গল, সাগর-মহাসাগর, মরুভূমি আরো কত কিছু সৃষ্টি করেছেন তা বলে শেষ করা যাবে না। মানুষের কথাই যদি বলি, অঞ্চল ভেদে মানুষ বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন স্বভাবের হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত জগতের অধিপতি, তা বিভিন্ন সফরের মাধ্যমে আরো সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়। তাই তো আল্লাহ্ তা'লা কোরআন মজীদে বলেছেন, **"সীরূ ফিল আরয"** অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমন কর। আর আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি বিপুল ঐশর্য্যকে অবলোকন কর, যার মাধ্যমে হৃদয়ে আল্লাহ্‌র আস্তিত্বের ধারণা জন্ম নেয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জনের জন্য যদি চীনেও যেতে হয় যাও এবং জ্ঞান অর্জন কর'। অর্থাৎ পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা একজন মুমিনের জন্য আবশ্যক। এতে জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃতি লাভ করে।

সেই লক্ষ্যেই প্রতি বছর জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ থেকে ৪র্থ ও ৫ম বর্ষের ছাত্রদেরকে দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে পাঠানো হয়। শিক্ষা সফরের জন্য কখনো রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, কুয়াকাটা, জাফলং, সুন্দরবন বা এমন অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে পাঠানো হয়। এ বছর আমাদের জন্য শিক্ষা সফর হিসেবে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ও সেন্টমার্টিন দ্বীপকে নির্ধারন করা হয়। ৪র্থ ও ৫ম বর্ষের ৬ জন করে ১২ জন ছাত্র এবং ৪ জন শিক্ষকসহ ১৬ জনের একটি কাফেলা শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে বের হই। এই সফরে আমীরে কাফেলা ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাওলানা সালেহ্ আহমদ সাহেব।

দিনটি ছিল ১৯ শে মার্চ ২০১৭, আমরা সকলেই সন্ধ্যা ৭ টায় আরামবাগ বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছি এবং সেন্টমার্টিন পরিবহনের মাধ্যমে টেকনাফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ২০তারিখ ভোরে আমরা টেকনাফে পৌঁছাই এবং নির্ধারিত শীপের মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। সমুদ্রের বুকে জাহাজ ভ্রমন অনেকেরই প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল। নাফ নদী অতিক্রম করে আমাদের জাহাজ যখন বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে, তখন ভিন্ন এক দৃশ্য আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। সমুদ্রের বিশালাকার ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে জাহাজ সামনের দিকে এগিয়ে চলে। যখন আমাদের জাহাজ সমুদ্রের মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছে তখন হঠাৎ করে সমুদ্র উত্তাল হয়ে যায় এবং ভয়ঙ্কর রূপ ধারন করে। উত্তাল ঢেউয়ের কারনে আমাদের জাহাজ এক পাশ থেকে অন্য পাশে হেলে যাচ্ছিল এবং আমরা ভয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থাকি। সমুদ্র তখন এত উত্তাল

ছিল যে, জাহাজের দুলনীতে আমার ও আরো দু-একজনের মাথা ঘুড়তে শুরু করে। প্রায় আধা ঘন্টা পর উত্তাল সমুদ্র শীতল হয় এবং জাহাজ পূর্বের গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রচন্ড ভয়কে অতিক্রম করার পরপরই জাহাজ থেকে সেন্টমার্টিন দীপের দৃশ্য আবছা আবছা আমাদের দৃষ্টিতে ধরা দিতে থাকে তখন এক রাশ আনন্দ এসে কিছুক্ষন আগের ভয়কে দূর করে আমাদের মনকে আনন্দে ভরে দেয়।

আমরা সকলেই জাহাজের রেলিং ধরে দ্বীপের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিলাম, কখন দ্বীপের মাটিতে পা রাখবো। যখন দ্বীপের একদম কাছাকাছি চলে আসলাম তখন আমরা দেখতে পেলাম সমস্ত দ্বীপটিতে শতশত নারকেল গাছ শির উচু

করে দাঁড়িয়ে আছে। যেগুলো দ্বীপের সৌন্দর্য্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এই নারকেল গাছের আধিক্যের কারণে এই দ্বীপটির আরেকটি নাম হচ্ছে **'নারিকেল জিঞ্জিরা'**।

জাহাজ থেকে আমরা দুপুর ১টায় সেন্টমার্টিনে পা রাখি এবং সুমন নামের একজন আহমদীর রিসোর্টে উঠি। সকলেই ফ্রেশ হয়ে খাওয়া দাওয়া করি এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সমুদ্র সৈকত দেখতে বেরিয়ে পরি। সমুদ্র সৈকতে গিয়ে ঢেউ এর শোঁ শোঁ শব্দে এবং শীতল বাতাসে সকলেরই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সকলেই প্রবালের উপরে ছবি তোলাতে ব্যস্ত হয়ে পরি, সন্ধ্যায় আমরা সমুদ্র সৈকত থেকে রিসোর্টে ফিরে আসি। রাতের খাওয়া দাওয়া শেষে সকলেই গল্পে মেতে উঠি। ক্লান্তি বেশি থাকার কারনে সেইদিন আমরা একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়ি।

২১ শে মার্চ ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমরা সকালের নাস্তা করি এরপর ছেড়াদ্বীপে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি ট্রলার ভাড়া করি। ছেড়াদ্বীপ হচ্ছে সেন্টমার্টিন দ্বীপের একটি উপদ্বীপ। প্রায় ৩০ মিনিট পর আমরা ছেড়াদ্বীপে পৌঁছি। সম্পূর্ণ দ্বীপটি শুধু কেয়াবনে ঘেরা, কিন্তু সমুদ্রের বুকে ছোট্ট উপদ্বীপটি এক অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি। যারাই সেন্টমার্টিনে আসে তারা অবশ্যই একবার হলেও ছেড়া দ্বীপের অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করে যায়। আমরা প্রায় ২ ঘন্টা সময় নিয়ে ছেড়া দ্বীপের সৌন্দর্য উপভোগ করি, সেখান থেকে ফিরে আসতে কারো মন চাচ্ছিল না, কিন্তু ফিরতে-তো হবেই। তাই আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব বাধ্য হয়ে লাঠি হাতে নেন এবং মজার ছলেই ডাণ্ডা খাওয়ার ভয় দেখিয়ে দ্বীপ ছাড়তে বাধ্য করেন। আমরা দুপুরের মধ্যে সেন্টমার্টিনে পৌঁছে সমুদ্র সৈকতে যাই, প্রথমে কিছুক্ষন ফুটবল খেলি এরপর প্রায় দেড় ঘন্টা সমুদ্রে গোসল করি। ঢেউয়ের সাথে তাল না মিলার কারনে অনেকেই লবনাক্ত পানি খেয়ে ফেলি। সমুদ্রের পানিতে সেকি লবণ! গলা দিয়ে একটু পানি ঢুকতেই যেন পেটের নাড়ি ভূড়ি বেরিয়ে আসতে চায়। সমুদ্রে গোসল সেরে আমরা রূপচাঁদা মাছের ফ্রাই, ছোট মাছের চর্চরি ও শুটকি ভর্তা দিয়ে দুপুরের খাবার খাই। সমুদ্র থেকে কিছুক্ষন আগে উঠানো তাজা রূপচাঁদার ফ্রাই! কি যে মজা না খেলে বোঝা সম্ভব না। দুপুরে একটু আরাম করার পর বিকেলে আবার ঘুরতে বের হই। দ্বীপে অনেক ঘোরাঘুরির পর আমরা সন্ধ্যায় সমুদ্র সৈকতের বিশ্রাম চেয়ার ভাড়া করি। সেগুলোতে হেলান দিয়ে বসে ঢেউয়ের উপরে ঢেউ আছড়ে পড়ার দৃশ্য আবলোকন করতে থাকি। ঢেউয়ের আওয়াজের সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও গান গাওয়া শুরু করি, অনেকে আবার কৌতুক পরিবেশন করে। সেই মূহুর্তটি ছিল খুবই আনন্দের। কিন্তু রাত অনেক হওয়ায় রিসোর্টে ফিরে আসতে হয়।

পরদিন অর্থাৎ ২২ তারিখ সকালে নাস্তা করে আমরা সাইকেল রেসের ব্যবস্থা করি। আমাদের গাইড আরশাদ সহ ১৭ জনের জন্য ১৫ টি সাইকেল ভাড়া করা হয়। দুইটি সাইকেল কম নেয়া হয় কারন দুই জন সাইকেল চালাতে পারে না। সাইকেলের মাধ্যমে আমরা সেন্টমার্টিনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নেই, যা ছিল প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। সাইকেলের মাধ্যমে আমরা দ্বীপটির আবহাওয়া অধিদপ্তর, মেডিকেল, ইউনিয়ন পরিষদ, আশ্রয়কেন্দ্র এবং নৌ-বাহিনীর প্রশিক্ষন কেন্দ্র পরিদর্শন করে আসি। যেহেতু সেই দিনই আমাদের সেন্টমার্টিন ত্যাগ করার কথা তাই খুব দ্রুত সবাই গোসল ও খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজ নিজ ব্যাগ গুছিয়ে জাহাজে চলে আসি। ২:৫০ মিনিটে সেন্টমার্টিন ছেড়ে টেকনাফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। যখন জাহাজ কিছু দূর চলে আসে তখন সবাই এক মায়ার টানে দ্বীপের দিকে তাকিয়ে থাকি এবং শেষ বিদায় জানাই। এমন মনে হচ্ছিল যেন কত বছর থেকে আমরা এই দ্বীপে বসবাস করছিলাম, এখন ছেড়ে যেতে হচ্ছে। এই চাপা কষ্টে সকলেই কিছুক্ষণ চুপচাপ ছিলাম। যখন জাহাজ সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে গাঁঙ্গচীল উড়ে এসে বিদায় জানায়, যেভাবে প্রথম দিন আমাদের সেন্টমার্টিন দ্বীপে স্বাগত জানিয়েছিল। আমরা সবাই নিজেদের বসার সীট থেকে শীপের রেলিংয়ে চলে আসি এবং কিছু খাবার কিনে পাখি গুলোকে খাওয়াতে থাকি। মনে হচ্ছিল পাখি গুলোর সাথে আমাদের এক নিবিড় সর্ম্পক রয়েছে। খাবার হাতে ধরতেই ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছিল, কোন প্রকার ভয় তাদের মধ্যে কাজ করছিল না। আমরা সকলেই খুব আনন্দ উপভোগ করি। দেখতে দেখতে আমরা বিকেলে টেকনাফে পৌঁছে যাই। এখানেই আমাদের সেন্টমার্টিন সফর শেষ হয়।

কক্সবাজারঃ

টেকনাফ পৌঁছে আমরা হালকা নাস্তা করে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে বাসে উঠি। রাত ৯টার সময় আমরা কক্সবাজারে পৌঁছি, সেখানে পূর্ব থেকেই সুমন সাহেব আমাদের জন্য ওয়েস্টার্ন হোটেলে চারটি কামরা বুকিং দিয়ে রেখেছিলেন। সেই হোটেলে আমরা আমাদের ব্যাগ রাখি, এরপর ফ্রেশ হয়ে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য হোটেল রোদেলাতে যাই।

২৩ তারিখ সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে আমরা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে চলে যাই। সৈকতে ফুটবল খেলি। এক পর্যায় আমাদের এক সহপাঠি জামিল হোসেনকে জোরপূর্বক কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বালিচাপা দেই! তার সমস্ত শরীর বালির মধ্যে অনেকটা গর্ত করে শুধু মাথাটি বাহিরে রেখে ঢেকে দেই। এরপর শুরু হয় সমুদ্রে গোসল করা। গোসলের সময় প্রত্যেককে ধারাবাহিক ভাবে লবনাক্ত পানিতে ডোবানো হয়, কেউ রেহাই পায়নি এই যাত্রায়। লবনাক্ত পানি খেয়ে সকলে খক-খক করে কাশতে থাকে। এরপর ফুটবল নিয়ে পানির মধ্যে কিছুক্ষন হ্যান্ডবল খেলা চলে। অনেক বড় বড় ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ে। সেই ঢেউয়ের মাঝে আমরা অনেকেই গাঁ এলিয়ে দেই এবং ঢেউয়ের সাথে তীরে এসে আছড়ে পড়ি। সে কি আনন্দ! তা বলে বোঝানো যাবে না।

হিমছড়িঃ

গোসল শেষে আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে একটি চাঁদের গাড়ী ভাড়া করে হিমছড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। কক্সবাজার থেকে সোজা রাস্তা, যার এক পাশে পাহাড় এবং অন্য পাশে সাগর। খুবই দেখার মতো দৃশ্য। শীতল বাতাসে সবারই মন ফুরফুরে হয়ে উঠে। এক সাথে আমরা গান গাইতে গাইতে পাহাড় এবং সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য অবলোকন করতে করতে হিমছড়িতে পৌঁছি। হিমছড়ি পাহাড় ঘেরা একটি এলাকা। এখানে সুউচ্চ পাহাড় গুলোতে অনেক গাছপালা, যেগুলো সবুজের সমাহার সৃষ্টি করেছে। অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে আমরা হিমছড়ি পাহাড়ের চূড়ায় উঠি, পাহাড়ের চুড়া থেকে সমুদ্র সৈকত খুবই

সুন্দর দেখাচ্ছিল। সমুদ্র হতে হিম বাতাস পাহাড়ে ধাক্কা খাচ্ছে। এজন্যই হয়তবা এই পাহাড় ঘেরা এলাকাটির নামকরণ করা হয়েছে হিমছড়ি। এরপর আমরা পাহাড়ের অন্য পাশের সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকের ঝর্ণা দেখার জন্য নামি, পাহাড়ের কোল ঘেষে ঝর্ণাটি একমনে ঝরে যাচ্ছে। আমরা ঝর্ণার পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে নেই এবং সেখানে সবাই ইচ্ছেমতো ছবি উঠাই।

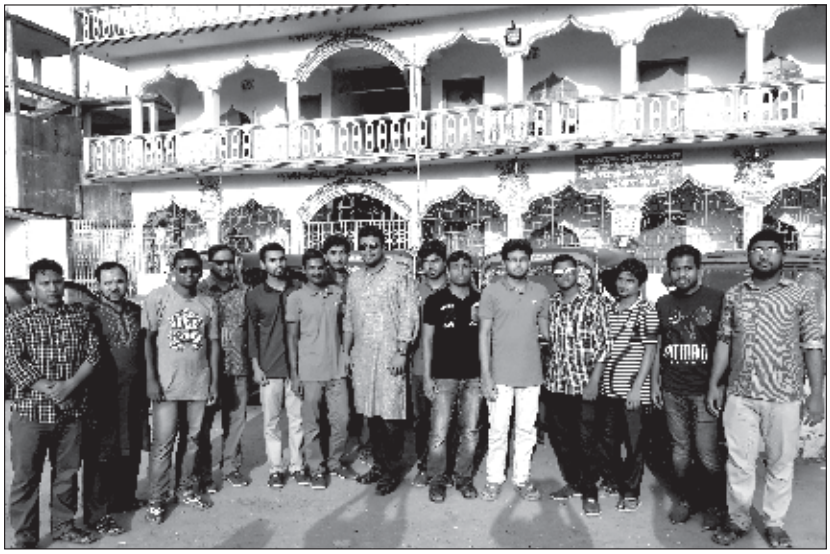

ইনানী বীচঃ

হিমছড়ি হতে আমরা পূনরায় চাঁদের গাড়ীতে চড়ে ইনানী বীচের দিকে রওয়ানা হই। ইনানী বীচে পৌঁছার কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, আমরা সবাই অধীর আগ্রহে সূর্যাস্ত দেখার জন্য সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। সূর্য তখন রক্তের মতো লাল রূপ ধারণ করে। সূর্যাস্তের এই অপরুপ সৌন্দর্য্যকে ধরে রাখতে সবাই সেই দৃশ্যকে ক্যামেরাবন্দি করি। কিন্তু সূর্য এক সময় আমাদের ফাঁকি দিয়ে সমুদ্রের মাঝে হারিয়ে যায়।

এরপর হোটেলে ফিরে এসে আমরা ফ্রেশ হয়ে রাতে কক্সবাজার বার্মিজ মার্কেটে ঘুরতে যাই। এই মার্কেটে সামুদ্রিক শামুক, ঝিনুকের অলংকারের পাশাপাশি বড় বড় সামুদ্রিক মাছের শুটকি, বার্মিজদের কাপড়, বার্মিজ আঁচার এবং বাচ্চাদের খেলনাসহ হরেক রকমের জিনিস পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ মার্কেট ঘুরে আমরা ছোট খাটো অনেক জিনিস কিনি। অনেকেই বাসার জন্য সামুদ্রিক মাছের শুটকি কিনে নেয়। মার্কেট ঘুরার পর আমরা রাতের খাবার খাই। খাবার খাওয়ার পর আমরা আমাদের ব্যাগ গুছিয়ে রাখি, কারণ সকালে উঠেই পতেঙ্গার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে হবে।

পতেঙ্গা :

২৪ মার্চ শুক্রবার, আমরা সকালে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে নির্ধারিত বাসে চড়ে পতেঙ্গা জামাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পতেঙ্গা আহমদীয়া মসজিদে পৌঁছে আমরা জুম্মার নামাজ আদায় করি। জুম্মার নামাজের পর স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব জহির আহমদ শাকিল সাহেবের বাসায় খাবার খাই। খাবার খাওয়ার পর আমরা প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বলি আমরা মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী **'আহমদ কবীর নূর মুহাম্মদ (রা.)'**-এর কবর জিয়ারত করতে চাই। প্রেসিডেন্ট সাহেব তিন জন খোদ্দামসহ আমাদেরকে মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই সাহাবীর সমাধীস্থলে নিয়ে যান। সাহাবীর কবরে দোয়া করার পর আমরা পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে যাই। সৈকতে ঘুরাঘুরি এবং ছবি তোলার পর আমরা সন্ধ্যা বেলায় সেখানে কাকড়ার ফ্রাই দিয়ে নাস্তা করি। পতেঙ্গাতে ঘুরার পর আমরা চিটাগাং চকবাজারস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদে যাই। সেখানে মাওলানা জাফর আহমদ সাহেব আমাদের স্বাগত জানান। আমরা মসজিদ কমপ্লেক্সে প্রবেশের পর মসজিদ ও লাইব্রেরি ঘুরে দেখি। এরপর স্থানীয় আমীর সাহেবের সাথে কথাবার্তা এবং খাওয়া দাওয়ার পর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সারা রাত সফর করে আমরা ২৫শে মার্চ ভোরে ঢাকায় পৌঁছি। আরামবাগ বাস স্ট্যান্ড থেকে রিক্শার মাধ্যমে বক্শীবাজারে আমাদের সেই চিরচেনা জামেয়াতে নিরাপদে ফিরে আসি। আল্লাহ্ তা'লার হাজার হাজার শুকরিয়া যে, এই সফরের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'লার অপরূপ সৃষ্টিকে দেখে অনেক জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেয়েছি এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশ **"সীরূ ফিল আরয"** পালনের মাধ্যমে হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভব করছি। (আলহামদুলিল্লাহ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

NURUDDIN

নূরুদ্দীন

2018

Jamia Ahmadiyya Bangladesh